জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৩৬

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী
কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

National Hawker Federation

অত্রি ভট্টাচার্য্য

অনন্ত ঋণের বাখান: দক্ষিন এশিয়ায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শোষণগাথা

অনন্ত ঋণের বাখান: দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা
Ononto Riner Bakhan: Dokkhin Esiyay Aiemef-Biswobyanker Shoshon Kotha

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে অনন্ত ঋণের বাখান: দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

বিশ্বব্যাঙ্ক-IMF স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসির গোড়াপত্তন পলাশী উত্তর সময়ে

বিশ্বেন্দু নন্দ

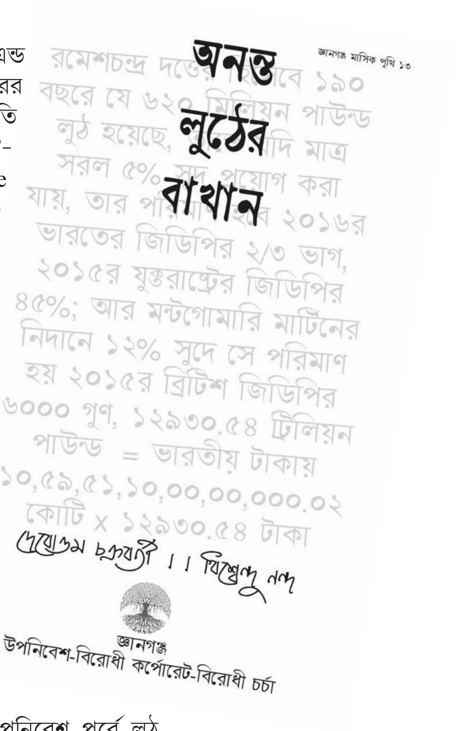

অমিয় কুমার বাগচী 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি'তে হয়ত প্রথমবার ১৯০ বছরের উপনিবেশকে শুধু স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতি বলছেন না, তুলনা করছেন বর্তমানের IMF-এর নীতির সঙ্গে that India underwent the equivalent of a two-century long IMF-style structural adjustment programme (SAP) in major parts of India। উপনিবেশের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতির মূল কম্পোনেন্ট লুঠ প্রক্রিয়া এটা আমরা ভুলে যাই। জ্ঞানগঞ্জের ১৩ পুথি 'অনন্ত লুঠের বাখান'এ আমরা তাঁর বক্তব্য IMF-style structural adjustment programme কে আদতে বুঝতে চেয়েছি উৎসা পট্টনায়ক, মন্টগোমারি মার্টিন সূত্রে। বলতে চাই যে রাষ্ট্রীয় নীতি কাঠামো উপনিবেশ লুঠ আয়োজনের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেটা আজও এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকায় দ্বিধাহীনভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। পাঠক অত্রি ভট্টাচার্য সম্পাদিত জ্ঞানগঞ্জ ৩৫ পুথি 'অনন্ত ঋণের বাখান: দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা' পড়ে বুঝবেন, 'অনন্ত লুঠের বাখান' ছিল উপনিবেশ পর্বে লুঠ আলোচনা; সম্পাদিত পুথিতে অত্রি বিভিন্ন সমীক্ষা, পুস্তক সূত্রে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন বর্তমান সময়ের পশ্চিমের লুঠ পর্ব। তিনি হয়ত বলতে চেয়েছেন উপনিবেশ তাত্ত্বিকভাবে লুপ্ত কিন্তু উপনিবেশিক লুঠ নীতি আজও সক্রিয় বিশ্বব্যাঙ্ক-IMF মার্ফৎ। সমস্যা হল স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতির আলোচনায় উপনিবেশ উঠে আসে না, অথচ এই নীতিই ছিল লুঠের মুখড়া - ইওরোপে পুঁজি সঞ্চয়নের প্রাথমিক শর্ত। অথচ অধিকাংশ মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক লুঠ নিয়ে নীরব। (মরিস) ডব 'স্টাডিজ ইন ডেভেলাপমেন্ট অব ক্যাপিট্যালিজম'এ চুপ থেকেছেন; (পল) সুইজি ডাউট নোট দিয়ে বলছেন প্রিমিটিভ একুমুলেশন, আদিম সঞ্চয় কীভাবে শিল্পে এল সে বিষয়ে মার্ক্সের আলোচনা কম। ডবের বক্তব্য, যারা প্রাইমারি একিউমুলেশন দিয়ে জমিদারি কিনেছিল, সেই জমিদারেরা জমি বিক্রি করে শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। সুইজি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন শ্রেণী তাদের থেকে জমিদারি কিনল, তিনি উপনিবেশিক লুঠের কথা বাধ্য হয়ে বলেন। তাই অমিয়বাবু অন্য কোনও সূত্র না পেয়ে বাধ্য হয়ে JAVIER CUENCA ESTEBANএর দুটি প্রবন্ধের সাহায্য নিচ্ছেন। ইরফান হাবিব বলছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবসর নিয়ে পূর্ব ভারত থেকে ফিরে আসা কোম্পানির ধনবান ভাগ্য ফেরানো আমলা 'নবোব'রা বন্ড এবং রিয়েল এস্টেট কিনছে। ঔপনিবেশিক লুঠ থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্প বিপ্লবে বিনিয়োজিত হচ্ছে। প্রিমিটিভ একুমুলেশনের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটার প্রাথমিক কারন ছিল কৃষি ধ্বংস, দ্বিতীয়ত বিশ্বজোড়া উপনিবেশ তৈরি, আর লুঠ। পুঁজিবাদের উদ্ভব স্বাভাবিক ইওরোপিয় দেশজ প্রক্রিয়া ছিল না — উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ জরুরি ছিল ইওরোপে শিল্প পুঁজি গঠনের জন্য। ঔপনিবেশিকতা পুঁজিবাদের বিকাশের প্রাথমিক প্রক্রিয়া, অন্যতম মৌলিক অনিবার্য পূর্বানুমান। ফলে অমিয়বাবুই দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশ চর্চা করা সেই

হাতেগোণা মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদ যিনি ব্রিটিশ শাসনকে শুধু লুঠেরা বললেন না, (বাম লব্জে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি (স্যাপ) গালিই) ১৯০ বছরের উপনিবেশিক শাসনকে স্যাপ যুগ আখ্যা দিলেন। এঙ্গাস ম্যাডিসনের হাতুড়ে জিডিপি হিসেব বাতিল করে বুকানন-কোলব্রুক-ল্যাম্বার্ট সমীক্ষা নির্ভর নতুন আঁক কষলেন। মাথায় রাখতে হবে এই এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া সম্পদ নির্ভর করেই বিশ্বব্যাঙ্ক-IMF-এর মত ব্রেটন উডস সংগঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বমহাজন হিসেবে বিশ্বরাজনীতিতে অবতীর্ণ হবে। আমি অমিয় কুমার বাগচী, মঙ্কটন জোনস, আর্থার এসপিনাল এবং শিনকিজি তানিগুচি সুত্রে চুম্বকে দেখাতে চেষ্টা করব উপনিবেশিক শাসকেরা কিভাবে নতুন উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ করছেন, এবং সেই অভিজ্ঞতা আপনি যেমন এই পুথিতে খুঁজে পাবেন, তেমনি গত নয়ের দশক থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক-IMF যে স্ট্রাকাচারাল এডজাস্টমেন্ট দক্ষিণ এশিয়ায় চাপিয়েছেন, তার সূত্রও যে আদতে উপনিবেশিক নীতি সেটা স্পষ্ট আন্দাজ করবেন। 'অনন্ত লুঠের বাখান' জ্ঞানগঞ্জ ওয়েবসাইটে [https://gyangonjo.org/] পিডিএফ সংস্করণ পাবেন। ষষ্ঠ পাতার শীর্ষক নতুন হাদি [Hadi] ফন্টে তৈরি।

আমি বিশ্বব্যাঙ্কের চরিত্র বিশ্লেষণে ব্রাঙ্কো মিলানোভিচের মূল্যায়নের সঙ্গে ভিন্নমত। পরিষ্কার, উডস সঙ্গঠনগুলো তৈরি হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ইওরোপ-আমেরিকার পক্ষ নিয়ে উপনিবেশিক লুঠ প্রক্রিয়া বজায় রাখতে [যে জন্য অমিয় কুমার বাগচী উপনিবেশিক স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতিকে IMF-style structural adjustment programme আখ্যা দিচ্ছেন] এবং ইওরো-আমেরিকিয় আধিপত্য রক্ষা করতে।

১

However, we must remember that India underwent the equivalent of a two-century long IMF-style structural adjustment programme (SAP) in major parts of India. There could be price depressions and on some occasions price inflations, such as the periods of the American Civil War, two World Wars, and the years between 1896 and 1913, superimposed on the long-term downward trend in income and living standards. Under the impact of the colonial SAP, hundreds of thousands of artisans lost their livelihood, productivity-increasing investment in agriculture shrank, and business communities in many parts of colonial India were pushed out of the most profitable avenues of trade or became subordinate collaborators of European businessmen. India witnessed some of the biggest famines in history, in Bengal from 1769, in south India from the 1780s down to the 1830s, and again between the 1870s and early 1900s in western and southern India, apart from many smaller famines that were not officially recognized (Arnold 1999; Klein 2001; Bagchi 2006[2005]: Chapter 18).
অমিয় কুমার বাগচী, কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি

২

The officials must be placed under an efficient control, the princes rendered innocuous, the system of finance rehabilitated, judicial protection established, and the security of person and property restored; and all this was impossible without a reform of military affairs, for the army was the ultimate basis of the whole edifice. If Hastings was to satisfy the demands of his employers, he must do no less than create afresh the entire system of government of Bengal. He must penetrate the baffling complexities and contradictions of the ancient growth he sought to replace, must understand and enter into the traditions, the prejudices, the habits

of a mass of peoples of immemorial age and unexampled tenacity, whose deepest and most ineradicable convictions and tendencies were foreign to him and to those whose co-operation he required. Nor was he free to use his own judgement and carry out his own views.
মঙ্কটন জোন্স, হেস্টিংস ইন বেঙ্গল

৩
In 1787 the Collectors had been prohibited from engaging in private trade, and the prohibition was now made applicable to the members of the Board of Revenue. 'This rule,' declared Cornwallis, 'has been adopted independent of any personal considerations, and it is our intention to consider how far the principle of it should be extended to other offices of importance, responsibility, and laborious duties, when the time of the occupants may be deemed sufficiently engaged in their public duties, and where they receive sufficient and liberal compensations for their services.'
আর্থার এসপিনাল, কর্নওয়ালিস ইন বেঙ্গল

নিচের দুটো উদ্ধৃতিই শিনকিজি তানিগুচি, গ্রামবাংলার ইতিহাস ও সমাজ থেকে
৪
১৭৯২ সালে পাশ হওয়া 'বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কালেক্টরশিপের পুলিশি আইন'-এর প্রথম ধারাতেই বলা হয়েছিল:
'দেশের পুলিশ ভবিষ্যতে একমাত্র সরকারি অফিসারগণের, যাঁরা ঐ কাজের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাঁদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন বলে বিবেচিত হবে। এই ধারাবলে জমিদার ও ইজারাদাররা তাদের শান্তি রক্ষার জন্য যে থানাদার ও পুলিশপ্রধানদের পোষণ করতেন, তাঁদের বরখাস্ত করবেন এবং কোনো জমিদার ও ইজারাদারই ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মচারী রাখতে পারবেন না।'২৪
জমিদারের পুলিশি বা থানাদারি ব্যবস্থা এইভাবেই অধিগ্রহণ করল কোম্পানির সরকার এবং সরকারি পুলিশ অফিসার বা দারোগা শ্রেণী নিয়োজিত হলেন জমিদারি এলাকায় তাঁদের সাহায্যের জন্য বা রইল আধাসামরিকবাহিনী।২০ দিনাজপুর জমিদারিটি ২৫টি থানা বা পুলিশি এলাকায় বিভক্ত হল এবং একজন করে দারোগা তাঁর বাহিনীসহ নিযুক্ত হলেন প্রতিটি থানায়। ব্রিটিশ ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর অধীনে দারোগারা নিযুক্ত হলেন, তিনি এইভাবে সমগ্র এলাকাটিকেই নিজের তদারকিতে রাখতে পারলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে জমিদার আর তাঁর জমিদারিতে কৃষকদের উপরে সেই সীমাহীন অধিকারকে খাটাতে সমর্থ হলেন না।

৫
[ক্লাইভের পরে কোম্পানি প্রধান] ভ্যানসিটার্ট [সরকারি] খরচ কমানোর কাজ শুরু করলেন। তিনি জমিদারের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের খরচ ২১,৮১৮ টাকা থেকে কমিয়ে করলেন ১৮,৫২৯ টাকা এবং স্থানীয় কর্মচারীদের খরচ ৫১,৭৮৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৩২,৭৩৮ টাকা।
যেসব কৃষি কর্মচারীদের রাজস্বমুক্ত ভূমি (চাকরান জমি) দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ তিনি কমিয়ে দিলেন নিম্নলিখিত হারে:

	কর্মীসংখ্যা হ্রাসের পূর্বে		রাখা চলবে	
	ব্যক্তি	বিঘা	ব্যক্তি	বিঘা
ডাক ও পাইক'	৬৭৪৩	১১৫৪৮৫	৩২০০	৮০০০০
বরকন্দাজ ও পিওন'	৫৫১	১৪৭১০	৪০০	১২০০০
সওয়ার (ঘোড়সওয়ার)	২৬৬	২৬৪৭৮	২০	২০০০
	৭৫৬০	১৫৬৬৭৩	৩৬২০	৯৪০০০

উৎস : সি সি আর এম-পি, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৭০।

স্বাধীন জনশুনানি ট্রাইব্যুনাল: উদ্দেশ্য আর কাঠামো

ধ্বংসাত্মক প্রভাবের গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, স্বচ্ছ মূল্যায়নের জন্য ট্রাইব্যুনাল

উদ্দেশ্য:

(১) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বাধীন সাক্ষ্য সংগ্রহ।

(২) বিশ্বব্যাংকের নীতি ও প্রকল্পের সামগ্রিক প্রভাবের মূল্যায়ন।

(৩) জবাবদিহি ও ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করা।

স্থান, তারিখ:

ভারত সভা, কলকাতা; ৭, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪।

বিচারকমণ্ডলী:

অর্থনীতিবিদ সি.পি. চন্দ্রশেখর, আইনবিদ অনুরাধা চেনয়, শিক্ষাবিদ সুজাত ভদ্র, সমাজকর্মী পামেলা ফিলিপোজ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সুপারিস

বিশ্বব্যাংকের ৮০ বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি একটি ব্যাপক জবাবদিহিতার সংকটে ভুগছে। এর নীতি অর্থনৈতিক অসমতা,

পরিবেশগত ধ্বংস ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

মৌলিক দাবিগুলো:

বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প ও নীতির পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

শীর্ষ-থেকে- সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে গ্রামসভা-কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে (‘গ্রামসভা লোকসভার ওপরে’)।

নদী সংরক্ষণ, বনাধিকার ও নগর উচ্ছেদ বিষয়ক নতুন আইন প্রণয়ন করে সমতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

মুনাফাকেন্দ্রিক প্রকল্পের মডেল পরিত্যাগ করে সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক, প্রকৃতি-সহিষ্ণু বিকল্প উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

এই জনশুনানি ট্রাইব্যুনাল কেবল অতীতের ভুলের হিসাব নেওয়ার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত, গণতান্ত্রিক ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের ভিত্তি রচনার প্রথম পদক্ষেপ। এটি একটি আহ্বান – সেই বিশ্ব গড়ার আহ্বান, যেখানে মানুষের জীবিকা ও পৃথিবীর সুস্বাস্থ্য কর্পোরেট মুনাফার চেয়ে বেশি মূল্যবান হবে।

আয়োজক:

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক কর্মগোষ্ঠী, হকার সংগ্রাম কমিটি, জাতীয় হকার ফেডারেশন, বন্দী মুক্তি কমিটি, জ্ঞানগঞ্জ প্রমুখ সংগঠনের জোট

বিশ্বব্যাংকের ৮০ বছর: জবাবদিহিতার সংকট ও একটি জনশুনানির আহ্বান

বিশ্বব্যাংক ৮০ বছরের ইতিহাসে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের নামে যে উন্নয়ন মডেল চাপিয়ে দিয়েছে, তাকে আমরা স্পষ্টভাবে সংকট জন্মদাতা মডেল হিসেবে চিহ্নিত করছি। এই প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের কাজকর্ম তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

(ক) কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা,

(খ) বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে এর বিধ্বংসী প্রভাব, এবং

(গ) জলবায়ু ও পরিবেশ সংকটে এর ভূমিকা।

আমরা প্রতিবেদনে দেখাতে পেরেছি, বিশ্বব্যাংকের নীতি ও প্রকল্পগুলো পরিবেশগত ধ্বংস, ব্যাপক উচ্ছেদ, গণ-স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবনতি, কৃষি সংকট, শ্রম অধিকার ধ্বংস এবং সম্পদ পুনর্বন্টনে চরম অসমতা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, বিভিন্ন সংগঠন আর ব্যক্তির উদ্যোগে কলকাতায় একটি স্বাধীন জনশুনানি ট্রাইব্যুনাল আয়োজন করা হয়। এই ট্রাইব্যুনালের লক্ষ্য ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা, বিশ্বব্যাংকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জোরদার করা এবং গণ-কেন্দ্রিক, প্রকৃতি-সহিষ্ণু বিকল্প উন্নয়ন রূপরেখার প্রস্তাবনা গড়ে তোলা।

প্রেক্ষাপট: একটি বিকৃত উন্নয়ন মডেলের ইতিহাস

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা স্বাধীনতা-উত্তর উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর নয়া-উপনিবেশিক নীতি চাপিয়েছে। ঋণ, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (SAP) এবং শর্তযুক্ত সাহায্যের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দেশগুলোর অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে এবং একটি পুঁজিবাদী-উদারনৈতিক উন্নয়নের রাস্তা জোর করে চালু করে, যার কেন্দ্রে রয়েছে বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকা হ্রাস।

কাঠামোগত ব্যর্থতা: প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন

বিশ্বব্যাংকের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব (‘লেগেসি কেস’) এর কার্যক্রমের গভীর ত্রুটির চিত্র তুলে ধরে।

পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা

অসম্পূর্ণ সমীক্ষা: নর্মদা বাঁধের মতো বৃহৎ প্রকল্প পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA), জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য বা সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই এগিয়েছে, যা সংবিধানিক ও নৈতিক নীতিমালার লঙ্ঘন।

তথ্য বিকৃতি: উর্বর জমিকে অনুর্বর বা উচ্ছেদের পরিমাণ কম দেখিয়ে মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে।

সামগ্রিক উপেক্ষা: একটি অঞ্চলের একাধিক প্রকল্পের সম্মিলিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে বিশ্বব্যাংক ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্জন ও প্রান্তিকীকরণ

পুনর্বাসনহীন উচ্ছেদ: MUTP-এর মতো প্রকল্প লক্ষাধিক মানুষকে উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু পুনর্বাসন জীবিকা ও মৌলিক অবকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ‘ঘেট্টো’ তৈরির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা: সিংগ্রৌলি বাইগা বা নর্মদার আদিবাসীদের মত সম্প্রদায়ের সাথে কোনো পরামর্শ বা অর্থপূর্ণ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদের উচ্ছেদ, সাংস্কৃতিক ক্ষয় ও স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রতিবাদকে দুর্বল করা: প্রকল্পের সত্যিকারের অংশীজনদের উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মানুষ ও প্রকৃতির চেয়ে মুনাফাকে অগ্রাধিকার

বাণিজ্যিক স্বার্থ: টাটা মুন্দ্রা বা নর্মদার মত প্রকল্পে দেখা গেছে, সমাজকল্যাণের চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থকে ঋণনীতিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশগত ক্ষয়: বন ধ্বংস, কৃষিজমির লবণাক্তকরণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি পরিবেশগত টেকসইতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার প্রমাণ দেয়।

অসমতা ও শোষণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

নয়া-ঔপনিবেশিক গতিশীলতা: ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত বন-লুণ্ঠনের মত শোষণমূলক ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে নব্য-উদারনৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খাতভিত্তিক অর্থায়ন: স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করে নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে কঠিন করা হয়েছে।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ: সমাজ ও অর্থনীতির ওপর ব্যাপক আঘাত

কৃষি: ১০ লক্ষাধিক কৃষি জমি হারিয়েছেন; ঋণের জালে আটকে ১ লক্ষেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ভর্তুকি হ্রাস ও উদার বাণিজ্য নীতির ফলে কৃষক ঋণবহুল হয়ে পড়েছে।

স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য বাজেট ৮-১৪% থেকে ৩-৪%-এ নেমে এসেছে। সরকারি হাসপাতালের অবনতি ও ব্যয়বহুল বেসরকারি স্বাস্থ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া এক সাথে চলছে। মিজোরামের মতো রাজ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় না থাকা এবং PPP মডেল চাপানো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেবাকে দুর্বল করছে।

শিক্ষা: ১৯৯০-এর দশক থেকে বড় আকারের বেসরকারিকরণ চাপানো হয়েছে, সরকারি স্কুলগুলো অবহেলিত। STARS প্রকল্পের মতো উদ্যোগে বিপুল অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও সরকারি শিক্ষাকে কার্যকরভাবে শক্তিশালী করা যায়নি।

জল: জল স্বল্পতার অজুহাতে জলজীবন মিশন ও নমামি গঙ্গে প্রকল্পের মাধ্যমে জলের বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সেচ প্রকল্পে তথ্য স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

*নগর উন্নয়ন:*JNNURM-এর মতো প্রকল্প শহরগুলোকে ‘বৃদ্ধির ইঞ্জিন’ হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করে গণসেবার বদলে অবকাঠামোর দিকে ঝোঁক তৈরি করেছে। হকার আইন (২০১৪) অস্বীকৃত থাকায় শহুরে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রান্তিক হয়েই রয়ে গেছেন।

শক্তি: রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডগুলিকে ভাগ করে বেসরকারি খাতের মুনাফাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সিংগ্রৌলির মতো খনিজ প্রকল্পে সৃষ্ট কিডনি সমস্যা ও ক্যান্সারের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করেছে।

খনিজ: আদিবাসী অঞ্চলে সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলের লঙ্ঘন করে খনি প্রকল্প স্থানীয়দের সম্মতি ছাড়াই চালু হয়েছে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে সিলিকোসিস রোগ চলমান সমস্যা।

জলবিদ্যুৎ: সিকিম ও হিমালয়ের মত ভূকম্পনপ্রবণ অঞ্চলে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিমবাহ ও ভূগর্ভস্থ জলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের হুমকি তৈরি করেছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মতামত উপেক্ষিত থাকছে।

জলবায়ু সংকট ও পরিবেশ উপনিবেশবাদ

বিশ্বব্যাংকের জবাবদিহিতার অভাব জলবায়ু ও পরিবেশ সংকটে ভয়াবহভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

জ্বালানি নীতি ও পরিবেশ প্রতারণা: ২০১৮ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বাণিজ্যিক অর্থায়নের মাধ্যমে এ খাতে বিপুল অর্থ (৭৩ বিলিয়ন ডলার) প্রেরণ অব্যাহত আছে।

মোনোকালচার বাগান, কার্বন বাজার (REDD+), জীববৈচিত্র্য অফসেট-এর মতো 'মিথ্যা সমাধান'-কে উৎসাহিত করে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের আর্থিককরণ ও 'সবুজ উপনিবেশবাদ'-কে ত্বরান্বিত করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণ: কার্বন অংশীদারিত্ব ও জীববৈচিত্র্য অফসেটের মত উদ্যোগ বন ও জীববৈচিত্র্যকে টাকার অঙ্কে পরিণত করে, স্থানীয় সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করে। ব্লু ইকোনমিক (নীল অর্থনীতি) উদ্যোগের মাধ্যমে উপকূলীয় প্রকল্প মৎস্যজীবীদের প্রথাগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে ও তাদের জীবিকা ধ্বংস করে।

জলবায়ু ন্যায়বিচারের নীতিকে দুর্বল করা: ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলন পরবর্তী সময় থেকে সাধারণ কিন্তু বিভেদিত দায়িত্ব (CBDR)এর মত মৌলিক নীতিকে দুর্বল করে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাধানকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের তথ্যপ্রসূত সম্মতি (FPIC) লঙ্ঘন হয়।

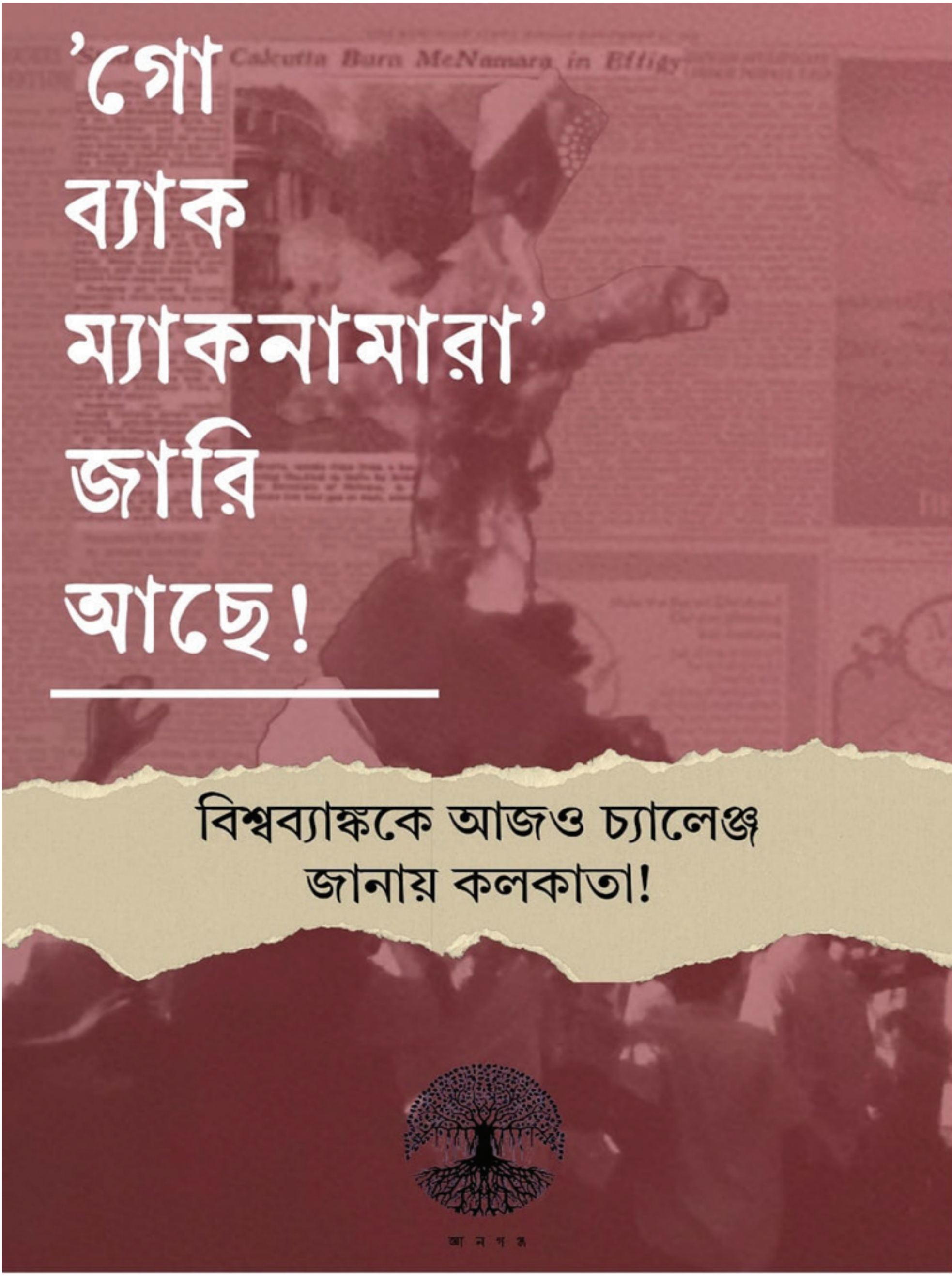
'গো
ব্যাক
ম্যাকনামারা'
জারি
আছে!
Calcutta Burn McNamara in Effigy
বিশ্বব্যাঙ্ককে আজও চ্যালেঞ্জ
জানায় কলকাতা!

জ্ঞা ন গ ঞ্জ

বিশ্বব্যাংকের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ‘স্বাধীন’ ট্রাইব্যুনাল – সর্বগ্রাসী প্রভাবের ৮০ বছর

৫ই ডিসেম্বর, ওয়ার্ল্ড ভিউ, বিকেল ৪টে

বক্তা:

মুরাদ হোসেন, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন

অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সেন্টার ফর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেবালিটি

আয়োজনে:

জ্ঞানগঞ্জ (উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা)

বিশ্বব্যাঙ্কের ৮০ বছরে উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন ও সেন্টার ফর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেবালিটি আয়োজিত গণট্রাইব্যুনালের শেষবেলায় আয়োজক সাথীদের সাথে।

‘কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’

**১৯৬৪ থেকে ২০২৪
কলকাতার বিশ্বব্যাঙ্ককে
প্রতিবাদ প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার বাখান জারি ছিল, আছে, থাকবে!**

বিশ্বব্যাংকের বিচার: ‘উন্নয়নের’ নামে শোষণ ও ধ্বংসের ৮০ বছর

স্বাধীন গণট্রাইব্যুনালের প্রতিবেদন

‘উন্নয়ন’ প্রতিষ্ঠানকে কাঠগড়ায় টেনে আনা

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রতিষ্ঠার ৮০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ে এই দুটি ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান নিজেদের পরিচয় দিয়েছে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে। কিন্তু এই ৮০ বছরে তাদের লক্ষ্যমাত্রা আদৌ কতটা সফল হয়েছে? তাদের ঋণ ও নীতির বলয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার কি উন্নতি হয়েছে, নাকি বেড়েছে শোষণ, ঋণের ফাঁদ, পরিবেশ ধ্বংস এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য? এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে ২০২৪ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল ‘বিশ্বব্যাংকের ৮০ বছর: স্বাধীন গণট্রাইব্যুনাল’ (Independent People’s Tribunal on 80 Years of World Bank)। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (IFIs) ওপর নজরদারি রাখা ওয়ার্কিং গ্রুপের নেতৃত্বে, প্রায় ৮০টি ভারতীয় সংগঠন ও ব্যক্তির সমন্বয়ে এই ট্রাইব্যুনালে ধ্বনিত হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, মৎস্যজীবী, আদিবাসী, শ্রমিক, গবেষক ও পরিবেশকর্মীদের কণ্ঠস্বর। ট্রাইব্যুনালে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিশ্লেষণ বিশ্বব্যাংকের তাবত উন্নয়ন বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করে এক ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই নিবন্ধ সেই ট্রাইব্যুনালের প্রতিবেদনের আলোকে বিশ্বব্যাংকের ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর অগণতান্ত্রিক, কর্পোরেট-মুখী ও ধ্বংসাত্মক প্রভাবের একটি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা।

ঋণের জাল: বিশ্বব্যাংকের ভারতীয় অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশের ইতিহাস

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন নয়। ১৯৪৮ সালে একটি রেল প্রকল্পের জন্য প্রথম ঋণ নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয় এই সম্পর্কের এক জটিল অধ্যায়। ট্রাইব্যুনালের প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকের ভারতে বিনিয়োগ-কে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছে।

প্রাথমিক পর্ব (১৯৪৮–১৯৭০-এর দশক): এ সময় মূলত অবকাঠামো (রেল, বন্দর, বিদ্যুৎ) ও কৃষি (সবুজ বিপ্লব) খাতে ঋণ দিত বিশ্বব্যাংক।

বিস্তার ও কাঠামোগত সমন্বয় (১৯৮০-১৯৯০-এর দশক): এই সময়েই বিশ্বব্যাংকের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক ‘কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি’ (SAPs) চাপিয়ে দেওয়া হয় ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে। বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ, বাণিজ্য উন্মুক্তকরণ, রাষ্ট্রীয় খাত সংকোচন – এই নীতিই ভারতের অর্থনীতির গতিপথ বদলে দেয়। রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া, কৃষিতে ভর্তুকি

কাটছাঁট, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতে বাজেট কমিয়ে আনা হয়।

সেক্টরাল সংস্কার ও পিপিপি (২০০০-২০১০-এর দশক): সরাসরি প্রকল্পে ঋণের বদলে 'নীতিভিত্তিক ঋণ' (DPLs) ও 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (PPPs)-এর যুগ শুরু হয়। রাজ্য সরকারগুলোর নীতিনির্ধারণে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হয় বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো খাতে। বিশ্বব্যাংকের প্রাইভেট শাখা আইএফসি (IFC) ভারতে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ করে অবকাঠামো খাতে।

সমসাময়িক পর্ব (২০১০-বর্তমান): 'জ্ঞানভাণ্ডার' ও ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাংক সরাসরি ঋণদাতার ভূমিকা থেকে সরে 'নলেজ ব্যাংক' বা জ্ঞানভান্ডারে পরিণত হওয়ার দাবি করে। কিন্তু এই 'জ্ঞান' আসলে কর্পোরেট-বান্ধব নীতি প্রণয়নের হাতিয়ার। 'বাণিজ্য করার সহজতা' (Ease of Doing Business - EoDB) সূচকের নামে শ্রম ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন শিথিল করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ডিজিটাল ভারত, আধার, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নাগরিক নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

'এক ডলার-এক ভোট' এর রাজনীতি: বিশ্বব্যাংকের শাসন কাঠামোতে 'এক ডলার-এক ভোট' নীতি চালু রয়েছে। যার অর্থ, যেসব দেশ বেশি অর্থ দেয় (যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত দেশ), তাদের ভোটের ক্ষমতাও বেশি। ফলে বিশ্বব্যাংকের নীতি ও ঋণবণ্টন সর্বদা এই ধনী দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থেই পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানেই যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের হার সর্বাধিক (IBRD-এ ১৫.৮৩%, IFC-তে ১৭.৪৭% ইত্যাদি)। এই অগণতান্ত্রিক কাঠামোই বিশ্বব্যাংককে 'উন্নয়নের' নামে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর ওপর নব্য-ঔপনিবেশিক নীতি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

প্রকল্পের ধ্বংসলীলা: উচ্ছেদ, পরিবেশ বিপর্যয় ও জীবিকা নাশ

বিশ্বব্যাংকের ঋণে করা প্রকল্পগুলো উন্নয়নের আলোকবর্তিকা হওয়ার বদলে কীভাবে কোটি কোটি মানুষের জীবনে অন্ধকার নিয়ে এসেছে, তার নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে ট্রাইব্যুনালের নানা সাক্ষ্যে।

সর্দার সরোবর বাঁধ (SSP): নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত এই মেগা প্রজেক্ট ছিল বিশ্বব্যাংকের অন্যতম বড় বিনিয়োগ (প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার)। কিন্তু এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। ৪০,০০০-এরও বেশি পরিবার (প্রধানত আদিবাসী ও কৃষক) তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়। পুনর্বাসনের নামে তারা পেয়েছে খুদকুঁড়োর থেকেও কম ক্ষতিপূরণ ও জীবনধারণের অযোগ্য জমি। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিশ্বব্যাংক প্রকল্প থেকে সরে এলেও, বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্দশার

শেষ নেই। পরিবেশগত বিপর্যয়ও হয়েছে ব্যাপক - উর্বর জমি ও বনভূমি জলমগ্ন হয়েছে, নদীর গতিপথ ও বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে, মাছের প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে।

টাটা মুন্দ্রা আল্ট্রা মেগা পাওয়ার প্রজেক্ট: বিশ্বব্যাংকের আইএফসি ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া এই কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুজরাটের মুন্দ্রা অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনধারা ধ্বংস করেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত ফুটন্ত জল সমুদ্রে মিশে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নষ্ট করেছে, মাছের প্রাপ্যতা ৭০-৮০% কমে গেছে। বাতাসে কয়লা ছাই ও দূষণ বৃদ্ধি পেয়ে শ্বাসকষ্টের রোগ বেড়েছে। স্থানীয় 'মাছিমার অধিকার সংগ্রাম সংঘ'-এর নেতা ড. ভারত প্যাটেলসহ মৎস্যজীবীরা আইএফসি-র বিরুদ্ধে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে প্রকল্পে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ এমিউনিটি বা প্রকল্পের ফলাফল বিষয়ে তার দায়মুক্তির অনুচ্ছেদ তুলে নিতে বাধ্য করিয়েছে। আন্দোলনের ইতিহাসে এটা একটি ঐতিহাসিক রায়। কিন্তু প্রকল্পটি চলমান এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ হয়নি।

মুম্বই আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প (MUTP): বিশ্বব্যাংকের ১১২৩ মিলিয়ন ডলার ঋণে করা এই প্রকল্পে প্রায় ৪ লাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছেন - আনুমানিক ১ লাখের চেয়ে অনেক বেশি। উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের (বিশেষ করে দরিদ্র, মুসলমান এবং প্রতিবন্ধী পরিবার) শহরের প্রান্তিক অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেখানে নেই পর্যাপ্ত জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রায় ৫৪% পুনর্বাসিত মানুষ তাদের আগের পেশায় ফিরতে পারেননি, নারীদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়েছে। উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় বড় নির্মাণ কোম্পানি ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা টিডিআর (Transferable Development Rights) এর সুবাদে মোটা অঙ্কের মুনাফা করেছে।

সিংগ্রৌলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র: মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের সিংগ্রৌলি-সোনভদ্র অঞ্চল 'ভারতের বিদ্যুতের রাজধানী' নামে পরিচিত। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে স্থানীয় বিশেষত বাইগা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের করুণ ইতিহাস। ১৯৭০-এর দশক থেকে শুরু করে একের পর এক কয়লা খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য লাখো মানুষ তাদের জমি-জীবিকা হারিয়েছেন। বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব পর্যালোচনাতেও স্বীকার করা হয়েছে পুনর্বাসন 'প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ' হয়েছে। আজ সিংগ্রৌলি পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্যহানি, বেকারত্ব ও সামাজিক অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ উদাহরণ।

সমাজ-বনায়ন কর্মসূচি: বন সংরক্ষণের নামে বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্প আদিবাসী ও বনজীবী সম্প্রদায়দের তাদের ঐতিহ্যবাহী বনভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। 'রাজাজি জাতীয় উদ্যান'-এর মতো প্রকল্পে সংরক্ষণের অজুহাতে বনবাসী মানুষদের জোরপূর্বক সরানো হয়েছে।

নীতির হস্তক্ষেপ: কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতের বেসরকারীকরণ

বিশ্বব্যাংকের নীতি প্রভাব শুধু প্রকল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা সরাসরি ভারতের

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের নীতিনির্ধারণে হস্তক্ষেপ করেছে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা: বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর চাপে কৃষি খাতে ভর্তুকি কাটছাঁট, বাজার খুলে দেওয়া ও সরকারের বাজার থেকে খাদ্যশস্য কেনা ব্যবস্থা দুর্বল করা হয়েছে। ফল? কৃষকদের ওপর বিপুল ঋণের বোঝা চেপেছে। প্রতিবেদনের দাবি, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর নীতির কারণে ভারতে ১০ লাখেরও বেশি কৃষক ভূমিহীন হয়েছেন এবং ১ লাখেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এই সংখ্যা আরও ভয়াবহ, কারণ এতে ভাগচাষি, আদিবাসী, দলিত ও নারী কৃষিকর্মীদের হিসাব নেই। ২০২০-এর তিনটি কৃষি আইন ছিল এই প্রবণতার চূড়ান্ত প্রকাশ, যা কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের মুখে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সরকার। এছাড়া রেশন ব্যবস্থায় জিন কারিকুরি করা ফর্টিফাইড চাল চাপিয়ে দেওয়ার মতো নীতিও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে উঠে এসেছে।

স্বাস্থ্য: বিশ্বব্যাংকের প্রভাবে ভারতের রাজ্যগুলোর স্বাস্থ্য বাজেট ৮-১৪% থেকে নেমে ৩-৪%-এ দাঁড়িয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের নামে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবহেলা, বেসরকারি হাসপাতালকে উৎসাহিতকরণ চলছে। কেরালার মতো রাজ্যের সরকারি হাসপাতালেও এখন ব্ল্যাকস্টোনের মতো আন্তর্জাতিক হেজ ফান্ডের মালিকানা দেখা যায়। স্বাস্থ্য এখন ‘সেবা’ নয়, ‘পণ্য’-এ পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা: একই ভাগ্য বরণ করেছে শিক্ষাখাত। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৯০,০০০ সরকারি স্কুল বন্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ৪২,০০০। বিশ্বব্যাংকের ‘STARS’ (Strengthening Teaching Learning and Results for States Program) প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলো পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন ও ডিজিটাল সরঞ্জামের ওপর জোর দেয়, কিন্তু শিক্ষার মৌলিক সমস্যা—অবকাঠামোর দুরবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা, প্রান্তিক শিশুদের প্রবেশাধিকার—সেগুলো অমীমাংসিত থাকে।

শহরায়ন ও ‘স্মার্ট সিটি’: জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনুয়াল মিশন (JNNURM) থেকে শুরু করে স্মার্ট সিটি মিশন—সব ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাংকের প্রভাব ও অর্থায়ন স্পষ্ট। এই মডেলে শহরকে ‘বাসস্থান’ না ভেবে ‘বিনিয়োগের গন্তব্য’ হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে পৌরসভাগুলোর ক্ষমতা হ্রাস করে বিশেষ উদ্দেশ্য যান (SPVs) গঠন করা হয়, যা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার বাইরে। ‘সৌন্দর্য্যায়নের’ নামে হকারদের মত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের শহর থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

শ্রম ও পরিবেশ আইন শিথিলকরণ: ‘বাণিজ্য সহজ করা’র নামে বিশ্বব্যাংকের প্রভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো শ্রম আইন ও পরিবেশ সুরক্ষা বিধি দুর্বল করেছে। চারটি নতুন শ্রম কোড শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার,

ছাঁটাই নিয়ন্ত্রণ, মজুরি সুরাক্ষার ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। একইভাবে পরিবেশ ছাড়পত্র (EIA) প্রক্রিয়া সহজ করা, বন সংরক্ষণ আইন (২০২৩ সংশোধনী) ও উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (CRZ) নীতিমালা শিথিল করে বনভূমি ও সেন্সিটিভ ইকোসিস্টেমকে কর্পোরেট দখলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

জলবায়ু সংকট: বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বড় 'ভণ্ডামি'

বিশ্বব্যাংক নিজেকে জলবায়ু সংকট মোকাবিলার নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও ট্রাইব্যুনালের প্রতিবেদন তাকে 'জলবায়ু ভণ্ডামির' প্রধান উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ঐতিহাসিক দায়: বিশ্বব্যাংক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী, বিশেষত গ্লোবাল সাউথে, কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেগা বাঁধ ও খনন প্রকল্পে ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে জলবায়ু সংকট তৈরি করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের পরও ২০২১ সাল পর্যন্ত তারা অন্তত ২৩ বিলিয়ন ডলার জীবাশ্ম জ্বালানি অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করেছে।

উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মিথ্যা সমাধান: জলবায়ু সংকটের সমাধান হিসেবে বিশ্বব্যাংক যে পথ দেখাচ্ছে, তা আসলে কর্পোরেট মুনাফা ও আর্থিকীকরণের নতুন পথ।

কার্বন ক্রেডিট ও REDD+: বনকে কার্বন শোষকের 'সম্পদ' হিসেবে বেচাকেনা করার এই বাজার আদিবাসী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করে এবং একচেটিয়া বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃত বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে। হিমাচল প্রদেশের কারচাম ওয়াংতু ও বাসপা-২-এর মতো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বনভূমি ধ্বংস ও জনবিস্ফোরণ সৃষ্টি করলেও কার্বন ক্রেডিট বিক্রি করছে।

সৌর ও বায়ু প্রকল্প: 'নবায়নযোগ্য শক্তি'-র নামে গুজরাটের পাবাগড়া বা রাজস্থানের ভাদলা সোলার পার্কের মতো প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে জবরদস্তি বা ফাঁদে ফেলে। এতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়া, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া ও স্থানীয় কৃষিজীবী-পশুচারীদের জীবিকা হানি ঘটেছে।

নীল অর্থনীতি: বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে 'নীল অর্থনীতি'র নামে উপকূলীয় অঞ্চলে মেগা বন্দর, পর্যটন ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, যা ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মৎস্যভাণ্ডার ও জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে।

জলবায়ু অর্থায়ন = জলবায়ু ঋণ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক দায়ী উন্নত দেশগুলি প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার (পরবর্তীতে ৩০০ বিলিয়ন) জলবায়ু তহবিলের বেশিরভাগই বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে, অনুদান হিসেবে নয়। ফলে জলবায়ু সংকটে সবচেয়ে কম দায়ী গরিব দেশগুলো আবারও ঋণের ফাঁদে পড়ছে। নতুন 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড'-এর ট্রাস্টিও বিশ্বব্যাংকের হাতে দেওয়ায় এই তহবিলও ঋণ

ও কর্পোরেট স্বার্থে ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

‘নলেজ ব্যাংক’ এর ভূমিকা: বিশ্বব্যাংক ‘জ্ঞানভাণ্ডার’ হিসেবে আইপিসিসি-র মতো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানভিত্তিক সতর্কতা উপেক্ষা করে বরাবর ‘বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল’ মডেলকেই ঠেলে দিয়েছে। স্থানীয়, দেশজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে ‘স্কেলেবিলিটি’ (বিপুলাকায় হওয়া) ও ‘ব্যাংকেবিলিটি’ (লাভজনক হওয়ার)-র ওপর জোর দেওয়া হয়।

কর্তৃত্ববাদী শাসন ও ডিজিটাল নজরদারিতে সমর্থন

বিশ্বব্যাংকের গভীর সমস্যা তৈরির দিক হল গণতন্ত্র আর মানবাধিকারে উদাসীন থেকে কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সমর্থন।

ঐতিহাসিক সমর্থন: শীতল যুদ্ধের সময় পিনোচেটের চিলি, সুহার্তোর ইন্দোনেশিয়া, মার্কোসের ফিলিপাইনের মতো সামরিক একনায়কতন্ত্রগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে বিশ্বব্যাংক তাদের দমন-পীড়নকে শক্তিশালী করেছিল।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ভারত: বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বড় ঋণগ্রহীতা ভারত। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে গণতান্ত্রিক স্থান সংকুচিত হওয়া, মতপ্রকাশের ওপর দমননীতি, মানবাধিকার কর্মী-সাংবাদিক-ছাত্রদের জেলেপোরা, UAPA-র মতো কঠিন আইনের অপব্যবহারের মধ্যেও বিশ্বব্যাংক ভারত সরকারের সাথে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়িয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, গতি শক্তি, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন কেন্দ্রীকরণ, নজরদারি ও সমালোচনা দমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিজিটাল কর্তৃত্ববাদ ও আধার: বিশ্বব্যাংকের ‘Identification for Development (ID4D)’ উদ্যোগ ভারতের আধার মডেলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে। আধার শুরু হয়েছিল সরকারি সুবিধা বিতরণের সরলীকরণের লক্ষ্যে, কিন্তু আজ তা ব্যাংকিং, টেলিকম, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে খাদ্য অধিকার পর্যন্ত সব সেবার ‘গেটকিপার’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়োমেট্রিক ব্যর্থতার কারণে অসংখ্য দরিদ্র, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষ পেনশন বা রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আইন বিশেষজ্ঞ উষা রামনাথনের মতে, এই সিস্টেম নাগরিকদের ‘ডেটা সাবজেক্ট’-এ পরিণত করেছে, যাদের গতিবিধি ও তথ্য রাষ্ট্র ও কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে।

ডেটা উপনিবেশবাদ: বিশ্বব্যাংকের মদদে গড়ে উঠা ডিজিটাল পরিচয় ও ডেটা সংগ্রহ ব্যবস্থা আসলে ‘ডেটা এক্সট্র্যাকটিভিজম’ বা তথ্য নিষ্কাশনের নতুন এক উপনিবেশবাদ। গ্লোবাল সাউথের মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য উত্তোলন করে তা গ্লোবাল নর্থের কর্পোরেশনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যারা তা থেকে মুনাফা করছে। কল্যাণ এখন ‘নজরদারিভিত্তিক’ ও ‘শর্তাধীন’ হয়ে পড়েছে।

প্রতিরোধের ইতিহাস: জনগণের সংগ্রাম ও জবাবদিহিতা

বিশ্বব্যাংকের ধ্বংসাত্মক প্রকল্প ও নীতির বিরুদ্ধে ভারতের মানুষ বরাবরই সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই প্রতিরোধ শুধু স্থানীয় সমস্যা সমাধান করেনি, আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বব্যাংকের জবাবদিহিতার কাঠামো তৈরিতেও ভূমিকা রেখেছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন: মেধা পাটকর-এর নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলন বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগে সর্দার সরোবর বাঁধের বিরুদ্ধে শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়ে এক আইকনিক সংগ্রামের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের চাপেই ১৯৯১ সালে গঠিত হয় 'মোর্স কমিশন', যার রিপোর্ট বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব নীতি লঙ্ঘনের কথা উন্মোচন করে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংককে প্রকল্প থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়। এই সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক তার 'ইনসপেকশন প্যানেল' গঠন করে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় অভিযোগ করতে পারে।

মুন্দ্রার মৎস্যজীবীদের লড়াই: মাছিমার অধিকার সংগ্রাম সংঘের নেতৃত্বে টাটা মুন্দ্রা প্রকল্পের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আইনি লড়াই চলে। আইএফসি-র বিরুদ্ধে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ রায় আদায় করে যে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ভোগ করতে পারে না। এরপরও ক্ষতিপূরণ আদায়ের লড়াই চলমান।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন, সিকিম: সিকিমে তিস্তা নদীতে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসী (লেপচা) সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্পগুলোর ভূমিকম্প প্রবণতা ও পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষা করা হয়। ২০২৩ সালে চুংথাং বাঁধ হিমবাহ হ্রদ আউটবার্স্ট ফ্লাডে (GLOF) ধ্বংস হওয়ায় তাদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। একজন কর্মী ৯৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে অনশন ধর্মঘট চালিয়েছেন।

মুম্বই ও অন্যান্য শহরের প্রতিরোধ: MUTP-র বিরুদ্ধে উচ্ছেদ হওয়া মানুষেরা, রাস্তার ফেরিওয়ালারা তাদের অধিকারের জন্য সংগঠিত হয়েছেন। 'ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন' এর নেতা শক্তিমান ঘোষের মতো ব্যক্তিরা তৃণমূল পর্যায়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

জবাবদিহিতা বিষয়ে যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা: যদিও ইনসপেকশন প্যানেল বা CAO (কমপ্লায়েন্স অ্যাডভাইজার অম্বুডসপারসন)-এর মতো ব্যবস্থা হয়েছে, সেগুলো প্রায়শই জটিল ও ধীরগতির। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ বা নীতি পরিবর্তন হয় না। ১৯৯৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ইনসপেকশন প্যানেলে গোটা বিশ্বের ১৭৩টি মামলার মধ্যে ২২টি ভারত থেকে দায়ের হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার অর্ধেক।

পুনর্বিবেচনার সময়, বিকল্পের সন্ধান

৮০ বছরের এই মূল্যায়নে স্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংক 'উন্নয়নের' আড়ালে একটি নব্য-ঔপনিবেশিক, কর্পোরেট-মুখী, বৈষম্য সৃষ্টিকারী ও পরিবেশ ধ্বংসকারী নীতি ভারতসহ গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা 'সংস্কার' করেনি, শুধু শব্দচয়ন বদলেছে: 'কাঠামোগত সমন্বয়' হয়েছে 'নীতিভিত্তিক ঋণ', 'বেসরকারীকরণ' হয়েছে 'পিপিপি', 'উন্নয়ন' এখন 'জলবায়ু অর্থায়ন'।

এই ট্রাইব্যুনাল ও তার প্রকাশিত প্রতিবেদনের জোরালো আহ্বান

১. *জবাবদিহিতা:* বিশ্বব্যাংককে তার প্রকল্প ও নীতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য আইনগত ও নৈতিকভাবে দায়ী হতে হবে।

২. *নীতির মৌলিক পরিবর্তন:* ঋণের ফাঁদ, কন্ডিশনালিটি, বেসরকারীকরণের পুরানো মডেল বর্জন করে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশবান্ধব, গণতান্ত্রিক বিকল্প অনুসরণ করতে হবে।

৩. *ক্ষতিপূরণ:* বিগত দশকগুলোর ক্ষতি স্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ও দেশগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. *বিকল্প আর্থিক কাঠামো:* ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে গ্লোবাল মেজরিটি দেশগুলোর নেতৃত্বে একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও একজোট নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক স্থাপত্য গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের ৮০ বছর পূর্তি শুধু উদযাপনের সময় নয়, এক গভীর পুনর্বিবেচনা ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবি তোলার সময়। ভারতের নর্মদা উপত্যকা থেকে মুন্দ্রার উপকূল, সিকিমের পাহাড় থেকে মুম্বইয়ের বস্তি—লাখো মানুষের সংগ্রাম ও ত্যাগ সেই দাবিকেই শান দিয়েছে। উন্নয়ন মানে কেবল জিডিপি বৃদ্ধি বা মেগা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের মর্যাদা, পরিবেশের ভারসাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তারা কি এই সহজ সত্যটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, নাকি পুরনো ধ্বংসাত্মক পথেই চলতে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

World Bank on 'Trial': A Report on the Proceedings, Testimonies, and Verdict - Independent People's Tribunal on 80 Years of World Bank, December 7-8, 2024, Kolkata.

প্রকাশক: Working Group on International Financial Institutions (WGIFIs)। জুন ২০২৫।

বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফের ঋণ চক্রের বিরুদ্ধে

ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন এবং মহিলা হকার ফেডারেশনের লড়াই:

অক্টোবর ১৬ – ১৮, ২০২৫

কোভিড-১৯ মহামারী শত শত কোটি মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়গুলোকে দারিদ্র্য, অনিশ্চিত অস্তিত্ব এবং অসমতার দিকে আরও গভীরভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে – যেখানে বিপুল সংখ্যক বেতনভুক্ত ও স্ব-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা হারানো এবং খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার আরও সীমিত হয়ে পড়ছে। অনুমান করা হচ্ছে যে মহামারী এবং এ দ্বারা অতিমাত্রায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে যেতে পারে। বিশ্বের সকল অঞ্চলে নারী, কন্যা শিশু এবং এলজিবিটিআই+ মানুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সংখ্যা ও তীব্রতা দুটোই বেড়েছে।

এটি কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যত্নের সংকট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলবায়ু ও বাস্তুসংস্থানিক জরুরি অবস্থা নিয়ে তীব্র একাধিক সংকটের একটি অভূতপূর্ব মুহূর্ত। মানবিক দুর্ভোগের জরুরিতা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানুষ ও সম্প্রদায়ের জন্য জরুরি অবস্থানে স্থানান্তরিত হতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিগুলো চলমান ঋণ সমস্যাটির ওপর তীব্র আলোকপাত করে, যা মানুষের বেঁচে থাকা, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই, তাদের মানবাধিকার, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক, লিঙ্গ ও বাস্তুসংস্থানিক ন্যায়বিচার এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সাধনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর মতো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ঋণদাতা, বেসরকারী ব্যাংক, স্পেকুলেটর এবং সরকারী বন্ড ও সিকিউরিটিজের বিনিয়োগকারীদের কাছে সরকারী বহিঃঋণ পরিশোধের জন্য বৈশ্বিক দক্ষিণ দ্বারা বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করা হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অবৈধ অর্থপ্রবাহও ঋণের সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এই অর্থটি কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবায় সরকারী বিনিয়োগ, ক্ষতিগ্রস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সহায়তা প্রদান এবং আরও ন্যায়সঙ্গত, সমতামূলক, জলবায়ু-সহনশীল এবং টেকসই ব্যবস্থার দিকে অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা যে সংকটের মুখোমুখি তা জরুরি ও তার তীব্রতা বিবেচনায় রেখে বলা যায়, ঋণ সমস্যার প্রতি প্রতিক্রিয়া সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল।

আইএমএফ এপ্রিল ২০২০-এ একটি কোভিড-১৯ ঋণ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং বলে যে এটি ৫০০ মিলিয়ন ডলার ব্যবহার করে ২৮টি দেশের দ্বারা আইএমএফ-কে করা কয়েক মাসের ঋণ পরিশোধ কভার করবে। আইএমএফ বলে যে এটি শেষ পর্যন্ত দুই বছরের পরিশোধের পরিমাণ কভার করার লক্ষ্য রাখে, কিন্তু এটি নির্ভর করবে এটি তার সিসিআরটি তহবিলের জন্য সদস্য সরকারগুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার পায় কিনা তার ওপর।

বাস্তবে, আইএমএফ তার দাবিগুলো বাদ দেয়নি। সিসিআরটি-তে বেশ কয়েকটি ধনী দেশের অবদান এই ২৮টি দেশের কাছ থেকে আইএমএফ-এর দাবি পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

একই মাসে, জি-২০ সরকারগুলি ঋণ সেবা স্থগিতাদেশ উদ্যোগ চালু করে – যা একটি বাতিলকরণ নয়, বরং

সরকারী ঋণের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পরিশোধের মাত্র আট মাসের বিলম্ব, এবং মাত্র ৭৩টি দেশকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে, মাত্র ৫.৩ বিলিয়ন ডলার দ্বিপাক্ষিক ঋণ প্রকৃতপক্ষে ৪৩টি দেশের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, যার সবই এখন ২০২২ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে পরিশোধের জন্য বাকি।

বেসরকারী ঋণদাতারা এ পর্যন্ত তারা যে ঋণের দাবি করে তার কোনটিই বাতিল বা স্থগিত করতে পারেনি। একইভাবে, বিশ্বব্যাংকের মতো বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলিও ঋণ বাতিল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে, বিশ্বব্যাংক, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়া পদক্ষেপের জন্য মোট ২০৫.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে প্রস্তুত। আইএমএফ গত ৬ মাসে ৮১টি দেশে ৮৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি জরুরি ঋণ অনুমোদন করেছে। এটি ন্যায়বিচারের একটি বিকৃতি যে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলি একাধিক সংকটের মুখে আরও বেশি ঋণ নিয়ে শেষ করবে।

ঋণের এই মাত্রাতিরিক্ত সমস্যাটি বিশাল প্রয়োজনীয়তা এবং ঝুঁকির মুখে সরকারী তহবিলের স্রোতের বাইরে।

এই ঋণের একটি বড় অংশ অবৈধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে ধার দেওয়া, লোভনীয় ঋণদানের দ্বারা চালিত, ক্ষতিকর প্রকল্প ও নীতির অর্থায়নে ব্যবহৃত, আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ, কঠিন ও অন্যায্য শর্তে বোঝা, বেসরকারী কর্পোরেশন দ্বারা সংগৃহীত কিন্তু সরকার দ্বারা গৃহীত বা বেসরকারী মুনাফার সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে সংগৃহীত, নষ্ট বা চুরি হয়ে গেছে।

ঋণের সাথে সংযুক্ত নীতি শর্তাবলী, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি সেবা ও সামাজিক

সুরক্ষা খাতে কাটছাট, বেসরকারিকরণ এবং রক্ষণশীল কর্মসূচি, ঋণ দেওয়ার চেয়ে কম নয় বরং সমান বা তারচেয়েও বেশি ক্ষতি করেছে, বিশেষ করে নারী ও কন্যা শিশু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সর্বাধিক দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ ও সম্প্রদায়ের ওপরে। এই শর্তাবলী সামাজিক সংঘাত, দারিদ্র্যের অপরাধীকরণ, এবং সামরিকীকরণ ও দমন-পীড়নকে তীব্রতর করেছে।

অধিকন্তু, দক্ষিণের দেশগুলির ঋণ ও ‘ঋণগ্রস্ততা’ হলো আধিপত্যের ফল এবং হাতিয়ার। এটি দেশ ও জনগণের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মসূচি গঠনের ক্ষমতাকে অবদমিত করে এবং সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে দুর্বল করে।

এই সমস্ত কিছু সেই সত্যের সাথে চরম বৈপরীত্য বহন করে যে, বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির জনগণ তাদের নামে করা ঋণের দাম বারবার বহন করেছে – তাদের অর্থ, তাদের জীবিকা, তাদের নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের জীবন এবং গ্রহের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে। এবং এই সমস্ত কিছুই বৈপরীত্য তৈরি করে দক্ষিণের জনগণের প্রাপ্য অনেক বড় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও বাস্তুসংস্থানিক ঋণের সাথে, যা শতাব্দীব্যাপী ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও তাদের শ্রম, যার মধ্যে রয়েছে নারীদের অবৈতনিক গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজ, শোষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

আমরা ‘ঋণ মুক্তি’-র থেকেও আরও বেশি দাবি করি ঋণ ন্যায়বিচার। আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, জাতীয় সরকার, সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুবর্তী হয়ে জরুরি, ন্যায়সঙ্গত, উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নেওয়ার এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই:

সকল দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও বেসরকারী ঋণদাতা, সব ক’টি দেশের জন্য সরকারী বহিঃঋণ পরিশোধ অন্তত আগামী চার বছরের জন্য শর্ত না রেখে বাতিল করতে হবে। এটা আশু পদক্ষেপ এবং বকেয়া ঋণ শর্তহীন বাতিল করার দিকে যাওয়ার স্পষ্ট কর্মসূচি। এছাড়াও, ঋণী সরকারগুলির ঋণ শোধ না করার ক্ষমতা আছে কিন্তু

দেখতে হবে তারা যেন জরিমানার সম্মুখীন হতে না হয়। ঋণ মুক্ত সম্পদ ব্যবহার করে, প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা, অন্য প্রয়োজনীয় সেবা আর অধিকার নিশ্চিত করা, জনগণ আর সমাজের নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সহায়তা দেওয়া, জরুরি জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আর ন্যায়সঙ্গত, মানবাধিকার রক্ষাকারী, লিঙ্গ, বর্ণ ও বাস্তুসংস্থানিক ন্যায়বিচার দেওয়া, জলবায়ু সহনশীল এবং গ্রহের স্বাস্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলা জরুরি।

জাতীয় ঋণ নিরীক্ষণ – সরকারী নিরীক্ষা এবং স্বাধীন নাগরিক নিরীক্ষা উভয়ই – যা ঋণের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, শর্তাবলী, ঋণের প্রকৃত ব্যবহার, এবং ঋণ-সমর্থিত নীতি ও কর্মসূচির প্রভাবগুলির সমালোচনামূলক পরীক্ষা করা, এবং অটেকসই ও অবৈধ ঋণের বৃদ্ধি রোধ করতে ঋণদান, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধের নীতির ব্যাপক পর্যালোচনা ও পরিবর্তন করা দরকার।

ঋণ সংকট সমাধানের জন্য অটেকসই ও অবৈধ ঋণ বোঝা ন্যায্য, স্বচ্ছ, বাধ্যতামূলক ও বহুপাক্ষিক কাঠামো (জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এবং ঋণদাতা-আধিপত্যমণ্ডিত অঞ্চলে নয়) নির্ণয় করা।

অটেকসই ও অবৈধ ঋণ জমে ওঠা রোধ করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলি শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করার

লক্ষ্যে ঋণদান, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধের নীতি, অনুশীলনের ব্যাপক জাতীয়, বৈশ্বিক পর্যালোচনা, পরিবর্তন।

· মানবাধিকারের প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রগুলো, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বেসরকারী ঘটকদের অনুরূপ বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি ও প্রয়োগ, যার মধ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তঃসীমানা দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের এখতিয়ারভুক্ত কোম্পানি, স্পেকুলেটর ও বিনিয়োগকারীদের কাজ বা অবহেলার প্রভাবের জন্য।

· অ-টেকসই ও অবৈধ ঋণের চুক্তিকরণ, ব্যবহার ও পরিশোধ এবং সেগুলি আদায়ের নিশ্চয়তায় আরোপিত শর্তাবলীর কারণে দেশ, জনগণ ও প্রকৃতির ওপর যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ।

আমরা ঋণ সমস্যার সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণ সমাধান চাই, যা অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার গভীর রূপান্তরের একটি অংশ, যা বর্তমান সংকট এর সময়ে একটি জরুরী দাবি।

IMF, ঋণচক্র ও বৈশ্বিক দক্ষিণের মেয়েরা

মুন্নি সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তৃতারত লেখক

ঋণ কী?

সহজ ভাষায় যদি আপনি ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন তাহলে ব্যাংকের কাছে আপনি ঋণী। আর যদি দশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, তাহলে ব্যাংক আপনার কাছে ঋণী। IMF হল এমন একটা সংস্থা যে বর্তমানে বিশ্বের ১৯১ টি দেশকে ঋণ দিচ্ছে। এটি এমন একটা সংস্থা যা বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে এবং তার ওপর নজর রাখে।

IMF এই দেশগুলিকে ঋণ দেয় এবং পরামর্শ দেয়, আর্থিক সমস্যা এড়াতে এবং তা থেকে পুনরুদ্ধার হতে সহায়তা করে। আর ঋণী দেশগুলি তাদের ঋণচুক্তির অংশ

হিসেবে দেশের নীতিগত পরিবর্তন আনতে সম্মত হয়। IMF এর একটি বিশেষ লিঙ্গবৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমি মূলত সেই দিকটি নিয়ে কথা বলব। ঋণগ্রস্ত দেশগুলির সরকারের সাথে IMF যে সমন্বয় পরিকল্পনা করে, তা শ্রমজীবী মানুষের ওপর নির্ভরশীল এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলারা এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই প্রভাবগুলি বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন। IMF কিন্তু এই সমস্যাকে adress করেছে এবং জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে যখন তারা আবিষ্কার করেছে যে মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণবৃদ্ধি পুঁজিবাদী মুনাফা তো ঘটাবেই বরং তার সাথে অর্থনীতির প্রসারও ঘটাতে পারে। IMF এর ‘ Finance and development ‘রিপোর্টে ২০১৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে , ‘এরা ডাবলা-নারিস’ এবং ‘কল্পনা কোচার’ লিখেছেন, ‘আইএমএফের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষেত্রটি কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লিঙ্গ বৈষম্যের অর্থনৈতিক প্রভাবের ওপর আইএমএফের প্রাথমিক গবেষণায় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পুরুষ ও নারী একই সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ প্রযুক্তি; আইনি অধিকার; এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য নারীদের সেই সম্ভাবনায় বাধা দেয়। … ফলত, নারীদের এই বাধাগুলি বৃহত্তর পরিসরে নিয়োগকারীদের জন্যেও বাধা যার ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পায়। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হ্রাসের ফলে অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়, তা উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলির জিডিপির আনুমানিক ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৩০ শতাংশেরও বেশি। সাম্প্রতিক গবেষণায় আবারও দেখা গেছে যে ক্রমবর্ধমান হারে নারীদের শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থনৈতিক সুবিধা পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে আরও অনেক বেশি।’

আইএমএফ কেবল ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নয়, বিশ্ব পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্যও কাজ করে। ১৯৯০-এর দশকে তারা ঋণ পরিশোধের জন্য বিশ্বজুড়ে দেশগুলির ওপর কঠোর নিয়ম আরোপ করে, কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়ার ফলে দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং লিঙ্গসমতা সম্পর্কে IMF তার বক্তব্য উন্নত করতে বাধ্য হয়। যেহেতু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই ছিল এর লক্ষ্য, তাই আমাদেরও এটাকে নারীদের সমানাধিকার নয় বরং বৃহৎ পুঁজির সমৃদ্ধির কৌশল হিসেবেই বোঝা উচিত। ভারতসহ বহু দেশ, যেখানে বেশীরভাগ মানুষই দরিদ্রসীমার নিচে এমনকি তারা ব্যাংকও ব্যবহার করেন না, সেখানে IMF নিজস্ব উদ্যোগে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য যে কোনও বাধা দূর করার দিকে মনোনিবেশ করেছে।

এইভাবে, জনসংখ্যার সর্বনিম্ন আয়ক্ষেত্রের মহিলাদের আত্মশোষিত ‘ক্ষুদ্র উদ্যমী’ হতে উৎসাহিত করা হয়। তারাও এই টিকে থাকার অর্থনীতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং সর্বোপরি, সারা জীবনের জন্য ঋণী হয়ে যায়। নতুন অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন তৈরি করা তো দূরের কথা, এই পন্থা শ্রম অনিশ্চয়তাকে আরও গভীর করে তোলে। এই পরিস্থিতি সেই অঞ্চলেই তৈরি হয় যেখানে চুক্তিহীন কর্মসংস্থান, কম মজুরি এবং বেকারত্বের মাত্রা বেশি থাকে এবং এর প্রকোপে পড়েন বিশেষ করে মহিলারা।

আইএমএফের কোনও নথিতে নারী শ্রম অধিকারের কথা উল্লেখ নেই। আইএমএফ যখন শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ করার কথা বলে, তখন নারীদের অধিকার সম্পর্কে একটি শব্দও ছাপানোর পরিবর্তে, এটি নিয়োগকর্তাদের ট্যাক্সে ছাড়সহ অন্যান্য সামাজিক সুবিধাগুলিতে পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। মানে সংক্ষেপে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আরও নিরাপত্তাহীনতা এবং মালিকশ্রেণির জন্য আরও সুবিধা। ৭০ শতাংশেরও বেশি পুরুষ শ্রমবাজারে সক্রিয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও কম। কিন্তু উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই সংখ্যা গড়ের চেয়ে বেশি, ৬২ শতাংশ। যেখানে নিম্নবিত্ত পরিসরের ৪২ শতাংশেরও কম মহিলা শ্রমবাজারে সক্রিয়। নিম্নবিত্ত মহিলারা যেখানে গৃহস্থালিসহ অন্যান্য কাজে দিনে গড়ে আট ঘন্টারও বেশি সময় ব্যয় করেন, সেখানে স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে থাকা মহিলারা দিনে মাত্র চার ঘন্টা ব্যয় করেন। এবং এতে সেই আট ঘন্টা কাজ করা মহিলাদের যা মজুরি হয়, তা তিন জনের একটি পরিবারের মৌলিক খাদ্যের চাহিদা মেটাতে যা প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক কম।

তাহলে IMF-এর মহিলাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগী বানানোর উদ্দেশ্য কী?

অবৈধ, অপ্রয়োজনীয় এবং প্রতারণামূলক ঋণ দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য তাদেরকে বাধ্য করা। প্রাপ্য সামাজিক পরিষেবাগুলি থেকে তাদের বাদ দেওয়া। এবং মহিলাদের অর্থ সংকটে ফেলে, তাদের মজুরি বাড়াতে বাধ্য করে, তাদের অবৈতনিক কাজের ঘন্টা বাড়ানো।

আইএমএফের প্রতিবেদনগুলি এই শ্রেণীগত পার্থক্যগুলিকে একটি গড়ের অঙ্কে ফেলে ঝাপসা করে দেয়। যার ফলে মহিলাদের চাহিদা উপযুক্ত নির্ণয়ের পথে সবচেয়ে বেশি বাধার সৃষ্টি হয়। আমরা দেখতে পাই গৃহস্থালির কাজসহ অন্যান্য পরিচর্যার কাজ যা মূলতঃ মহিলাদের কাজ, সেগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করা হয় কারণ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই কাজগুলো মূল্যহীন। অথচ, এই কাজগুলোকে

হাতিয়ার করেই তারা তাদের সুবিধামত বৃহত্তর বদল আনে। দেশের দারিদ্র্য বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক কারণ।

তবে ঋণের এই অনন্ত লুঠ বন্ধ করা অসম্ভব নয়। জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করতে হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণে। শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা এবং নারীদের অনিশ্চিত জীবনকে ঋণ পরিশোধের মাধ্যম বানিয়ে তোলা আইএমএফ এবং তার সরকারগুলির কাছ থেকে আমাদের জন্য যে নির্মম ভবিষ্যত অপেক্ষায় রয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি প্রয়োজন হবে এবং আমার বিশ্বাস, নারীরা তাতে সামনের সারিতে থাকবে।

বিশ্বব্যাংক প্রসঙ্গে ব্রাঙ্কো মিলানোভিচের সমালোচনা – একটি বিশ্লেষণ

বৈশ্বিক অসমতা বিষয়ে গবেষণার জন্য খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ব্রাঙ্কো মিলানোভিচ বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা বিভাগে দীর্ঘ দুই দশক (১৯৯১-২০১৩) কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একে একইসাথে অপরিহার্য ও ত্রুটিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার বক্তব্য হলো, বিশ্বব্যাংক শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংস্থা নয়, বরং এটি এর প্রধান শেয়ারহোল্ডার দেশগুলো (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব) ভূ-রাজনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থেরও তল্পিবাহক। তিনি বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য কমানোর ভূমিকার প্রশংসা করলেও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, বৈষম্য উপেক্ষার ঐতিহাসিক প্রবণতা এবং 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' এর মত একরৈখিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। এই নিবন্ধে মিলানোভিচের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের একটি দ্বন্দ্বময় চিত্র—যা জ্ঞান ও অর্থায়নের ভাণ্ডার এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের মধ্যে আটকে আছে—তা উপস্থাপন করা হবে।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর মতো ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থাপত্যের মেরুদণ্ড। তবে সেগুলোর কার্যক্রম ও নীতি সর্বদা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ব্রাঙ্কো মিলানোভিচ, যিনি

তার elephant chart (এলিফ্যান্ট চার্ট বা 'ল্যাকনার-মিলানোভিচ রেখা' ১৯৮৮-২০০৮ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আয় বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে, যা এশিয়ার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ('কুঁজ') এবং বিশ্বব্যাপী অভিজাত শ্রেণীকে ('কাণ্ড') কেন্দ্রে বসায়, দেখায় উন্নত দেশগুলির শ্রমজীবী/মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় স্থবির হয়ে পড়েছে ('খাত'), যা ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং পপুলিজমকে ব্যাখ্যা করে) এর মাধ্যমে বৈশ্বিক আয় বৈষম্যের গতিশীলতা জনপ্রিয় করেছেন, তিনি শুধুই সমালোচক নন - বরং বিশ্বব্যাংকের অন্দরে থেকে কাজকর্ম দেখা গবেষক। তার দৃষ্টিভঙ্গি তাই তত্ত্বীয় সমালোচনা ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল মিলানোভিচের লেখা ও বক্তব্য পর্যালোচনা করে বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে তার বহুমুখী ও প্রায়শই সমালোচনামূলক অবস্থানগুলি বর্ণনা করা।

একটি আদর্শিক যন্ত্র হিসেবে বিশ্বব্যাংক

মিলানোভিচ (২০১৬, ২০১৯) যুক্তি দেখান যে বিশ্বব্যাংক একটি নিরপেক্ষ, কেবলমাত্র তথ্য-ভিত্তিক সংস্থা নয়। সময়ের সাথে সাথে এর নীতি প্রধান পুঁজিবাদী

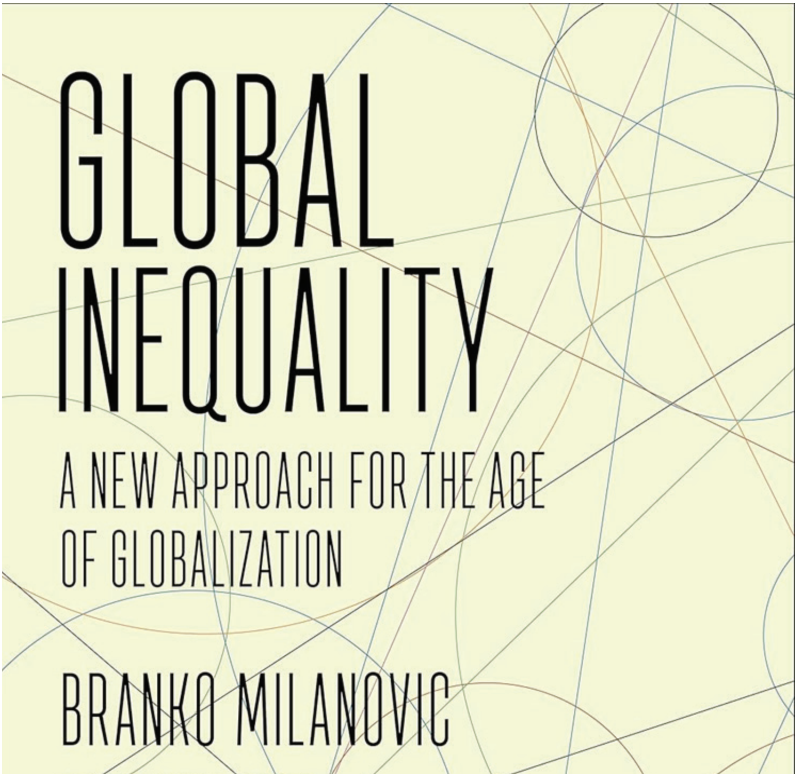

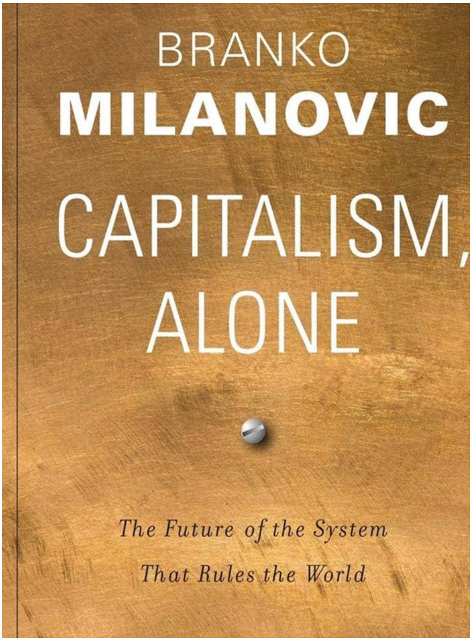

দেশগুলোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত করেছে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকের 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' এর যুগে বিশ্বব্যাংক বেসরকারিকরণ, বাণিজ্য উদারীকরণ ও রাজস্ব সংকোচনের একটি সার্বজনীন খাঁচা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধি ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে (Milanović, ২০১৭)। তিনি মনে করেন, ২০০৮-এর আর্থিক সংকটের পর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে, এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ভূমিকা স্বীকার করা শুরু হয়েছে।

বৈষম্য: উপেক্ষিত এজেন্ডা

মিলানোভিচের মূল আপত্তি হলো বিশ্বব্যাংকের ঐতিহাসিকভাবে 'দারিদ্র্য' ও 'বৈষম্য'-র মধ্যে একতরফা জোর দেওয়া। বিশ্বব্যাঙ্ক চরম দারিদ্র্য বিমোচনে (যেমন, $১.৯০/দিন রেখা) বিশাল সাফল্য অর্জন করলেও জাতীয় পর্যায়ে আয় ও সম্পদের আপেক্ষিক বৈষম্য কমাতে ততটা মনোনিবেশ করেনি। তিনি বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব তথ্য (PovcalNet) ব্যবহার করেই তার যুগান্তকারী 'elephant chart' তৈরি করেন, যা দেখায় বৈশ্বিকায়নের ফলে এশিয়ার মধ্যবিত্ত ও বিশ্বের শীর্ষ ১% ধনীরা লাভবান হলেও উন্নত বিশ্বের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের আয় স্থবির রয়েছে (Milanović, ২০১৬)। এটি ছিল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমেই এর একটি সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করা।

অভ্যন্তরীণ শাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা

একজন প্রাক্তন কর্মী হিসেবে মিলানোভিচ (২০২০, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন।

নেতৃত্ব নির্বাচন: বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সাধারণত আমেরিকান এবং আইএমএফের

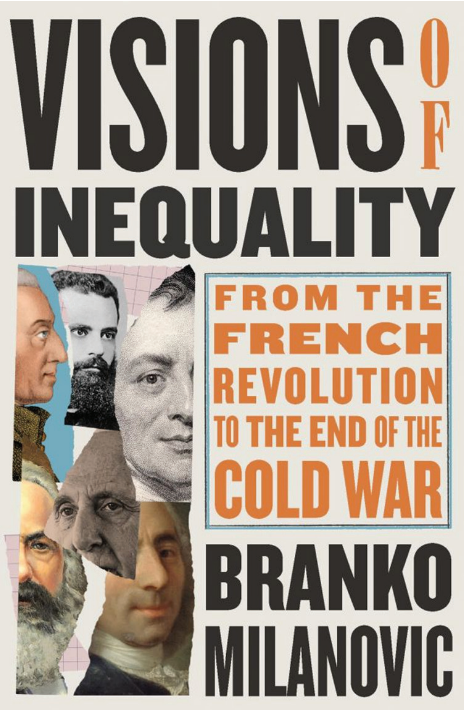

প্রধান ইউরোপীয় হন। এই রীতিকে তিনি 'অযুগোপযোগী' এবং ফলে বৈশ্বিক দক্ষিণের কাছে ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্যতা কমছে।

কর্পোরেট লাইন: তার মতে, বড় শেয়ারহোল্ডার দেশগুলোর স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে এমন স্বাধীন ও সমালোচনামূলক গবেষণা প্রায়শই প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই নিরুৎসাহিত বা দমন করা হয়।

ইতিবাচক ভূমিকার স্বীকৃতি: সমালোচনা সত্ত্বেও, মিলানোভিচ বিশ্বব্যাংকের কয়েকটি মৌলিক ও অপরিহার্য ভূমিকার স্বীকৃতি দেন।

জ্ঞান ও তথ্যের ভাণ্ডার: বিশ্বব্যাংককে বৈশ্বিক উন্নয়ন তথ্যের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা হিসেবে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন।

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন: বেসরকারি পুঁজি যেখানে যায় না, এমন অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংকট মোকাবেলা: বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালে (যেমন ২০০৮ বা কোভিড-১৯) যখন বেসরকারি পুঁজি প্রবাহ শুকিয়ে যায়, তখন বিশ্বব্যাংক বিপরীত-চক্রীয় (counter-cyclical) ভূমিকা পালন করে।

সংস্কারের প্রস্তাব: একটি বহু-মেরুবিশ্বের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান

মিলানোভিচের মতে, বিশ্বব্যাংকের অস্তিত্ব প্রয়োজন, তবে তাকে সংস্কার করতে হবে।

বৈষম্যকে মূল এজেন্ডা করা: দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি বৈষম্য হ্রাসকে সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা অর্জন: প্রধান শেয়ারহোল্ডারদের বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হওয়ার বদলে সত্যিকারের বৈশ্বিক উন্নয়নের সেবক হতে হবে।

বহু-মেরুবিশ্বের প্রতিফলন: যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে সরে এসে চীন, ভারতসহ উদীয়মান শক্তিগুলোর জন্য আরও অর্থপূর্ণ কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রাঙ্কো মিলানোভিচের বিশ্লেষণ বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে একটি দ্বৈত ও জটিল বাস্তবতা উপস্থাপন করে। একদিকে, এটি উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্টি, তথ্য সংগ্রহ ও সংকটকালীন অর্থায়নের একটি অনন্য এবং অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা ক্ষমতার ভারসাম্য ও সময়ের আধিপত্যবাদী আদর্শ দ্বারা সীমাবদ্ধ। মিলানোভিচের প্রধান অবদান হলো তিনি বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব তথ্য ও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এর একটি মুখ্য ত্রুটি—বৈষম্যের প্রশ্নে অনীহা—কে চিত্রিত করেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সংস্কারবাদী; বিশ্বব্যাংককে ভেঙে দেওয়ার নয়, বরং তাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্য-সচেতন একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান। একটি ক্রমশ বহু-মেরুবিশ্বে বিশ্বব্যাংকের ভবিষ্যৎ তার এই সংস্কারক্ষমতার ওপরই নির্ভর করবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

Milanović, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.;

Milanović, B. (2017). The Humanitarian and Morally Obscene Washington Consensus. [ব্লগ পোস্ট]. globalinequality.com.;

Milanović, B. (2019). Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World. Harvard University Press.

Milanović, B. (2020). World Bank: An Insider's Critique. [সাক্ষাৎকার]. বিভিন্ন মিডিয়া সাক্ষাৎকারের সমন্বয়।

World Bank. (Various Years). PovcalNet: The Online Tool for Poverty Measurement. [ডেটাবেস]। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ।

বিশ্বব্যাংকের জলবায়ু বিপর্যয় বিনিয়োগ: জীবাশ্ম জ্বালানির পথে একটি বিপজ্জনক যাত্রা

বিশ্ব আজ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রতিনিয়ত ঘনীভূত হচ্ছে, অথচ যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের কথা বলে, তারাই চালিয়ে যাচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিপুল বিনিয়োগ। ‘বিগ শিফ্ট গ্লোবাল’ নামক একটি বহুস্তরবিশিষ্ট বৈশ্বিক প্রচারণা এই দ্বিমুখীতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপের মতো বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর (এমডিবি) কাছে তাদের জরুরি দাবি: জীবাশ্ম জ্বালানিতে সমস্ত অর্থায়ন বন্ধ করুন এবং টেকসই নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে সম্পূর্ণরূপে সরে আসুন।

প্যারিস চুক্তি ও বিশ্বব্যাংকের অঙ্গীকারভঙ্গ

২০১৫ সালে গৃহীত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প স্তরের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার অঙ্গীকার করে। কিন্তু সেই অঙ্গীকারের ঠিক পর থেকেই বিশ্বব্যাংক গ্রুপ বরাদ্দ করেছে ১৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্প ও নীতিতে। এটি একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য, বিশেষ করে যখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান, আফ্রিকা থেকে লাতিন আমেরিকা — সর্বত্রই লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, অর্থনীতি বিপর্যস্ত এবং জীবনহানির শিকার হচ্ছে।

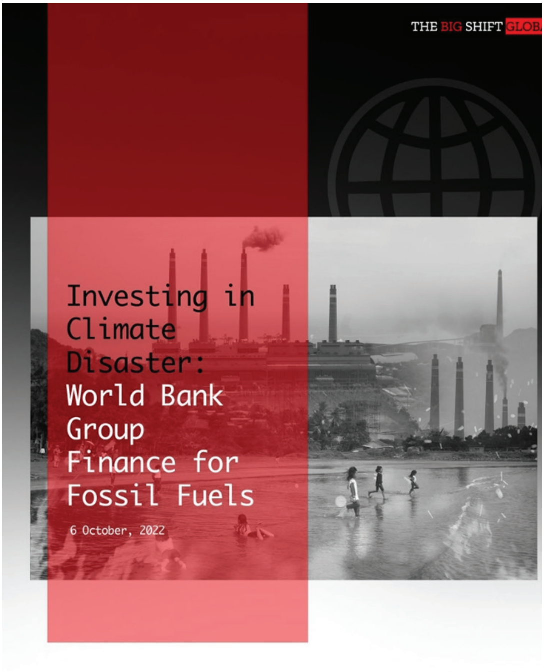

“It's really, really bad, under his (Malpass') leadership, he has directed continued funding of fossil fuels, which is ridiculous.”
–
Al Gore
(Fortune, 2022)

বিশ্বব্যাংক গ্রুপ গঠিত

হয়েছে পাঁচটি সংস্থার সমন্বয়ে: IBRD, IDA, IFC, MIGA ও ICSIDI - মুখ্য উদ্দেশ্য চরম দারিদ্র্য বিমোচন ও সমৃদ্ধি গড়ে তোলা। কিন্তু তাদের অর্থায়নের একটি বড় অংশ যাচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো প্রকল্পে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করছে।

বিশ্বব্যাংকের 'শীর্ষ দশ' জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্প: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বিগ শিফ্টের প্রতিবেদনে ২০১৮-২০২১ অর্থবছরের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে করা সবচেয়ে বড় দশটি প্রত্যক্ষ জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পের তালিকা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১. *ট্রান্স-আনাতোলিয়ান পাইপলাইন (তুরস্ক/আজারবাইজান):* MIGA-এর ১.১১ বিলিয়ন ডলারের গ্যারান্টি। এই পাইপলাইন ইউরোপে গ্যাসের ব্যবহার দীর্ঘায়িত করবে।

২. *গ্যাস স্টোরেজ সম্প্রসারণ প্রকল্প (তুরস্ক):* IBRD-এর ৬০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ। প্রাকৃতিক গ্যাস অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা।

৩. *ঘোড়াসাল পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্প (বাংলাদেশ):* MIGA-এর ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টি। জীবাশ্ম গ্যাস ব্যবহারকারী একটি রাসায়নিক উদ্যোগ।

৪. *পাওয়ার সিস্টেম দক্ষতা ও সহনশীলতা প্রকল্প (মিয়ানমার):* IDA-এর ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ। বিদ্যমান গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্প্রসারণ।

৫. *গ্যাস ন্যাচারাল আসু (ব্রাজিল):* IFC-এর ২৮৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ। নতুন এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র।

৬. *CELSE গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র (ব্রাজিল):* IFC-এর ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ। আরেকটি বৃহৎ গ্যাস প্রকল্প।

৭. *ACKWA পাওয়ার সিরদারিয়া (উজবেকিস্তান):* MIGA-এর ২০০ মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টি। ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র।

৮. *সেম্বকর্প মিইয়াংইয়ান পাওয়ার কোম্পানি (মিয়ানমার):* MIGA-এর ১৭০.৩ মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টি।

৯. *বসরা গ্যাস কোম্পানি (ইরাক):* IFC-এর ১৫৭.৭৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ। গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা।

১০. প্যান আমেরিকান এনার্জি (আর্জেন্টিনা): IFC-এর ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ। একটি তেল শোধনাগার সম্প্রসারণ।

প্রায় সব কটি প্রকল্পের প্রতিবেদনে স্থানীয় সমাজ উচ্ছেদ, বায়ুদূষণ, জল দূষণ, জীববৈচিত্র্য ক্ষতি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে প্রকল্প থেকে নির্গমনের মাধ্যমে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব।

পাঁচটি অতিরিক্ত কেস স্টাডি: নীতি ও পরোক্ষ অর্থায়নের ভয়াবহতা

শুধু প্রত্যক্ষ ঋণ নয়, বিশ্বব্যাংকের নীতি পরামর্শ ও পরোক্ষ অর্থায়নও দেশগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানির ফাঁদে আটকে দিচ্ছে।

১. *ইন্দোনেশিয়া:* জাভা ৯ ও ১০ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র: IFC-এর অর্থায়নে পরিচালিত হানা ব্যাংক এই কয়লা প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে। IFC এর 'গ্রিন ইক্যুইটি অ্যাপ্রোচ'-এর সরাসরি লঙ্ঘন এটি।

২. *পাকিস্তান কান্ট্রি ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (২০২২):* বিশ্বব্যাংকের খসড়া প্রতিবেদনে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আমূল পরিবর্তনের পরিবর্তে গ্যাসকে 'ব্রিজিং ফুয়েল' হিসেবে দেখানো হচ্ছে, যা পাকিস্তানের জন্য নতুন করে ঋণের বোঝা তৈরি করবে।

৩. *ঘানা:* জীবাশ্ম জ্বালানির চুক্তিতে আবদ্ধ: বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন অর্থ সংস্থার পরামর্শে ঘানা 'টেক-অর-পে' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে এখন দেশটিকে তার চাহিদার চেয়ে বেশি গ্যাস ও বিদ্যুৎক্ষমতার জন্য বছরে ১.২ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হচ্ছে।

৪. *গায়ানা:* তেল কোম্পানিদের জন্য পথ সুগম করা: বিশ্বব্যাংকের ৫৫ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের মাধ্যমে গায়ানার তেল ও গ্যাস খাতের আইনি কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এক্সনমবিলের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো লাভবান হয়। দেশটি তার বিপুল সৌর ও বায়ু সম্পদ উপেক্ষা করে তেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

৫. *দক্ষিণ আফ্রিকার মেডুপি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র:* বিশ্বব্যাংকের ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলারের এই ঋণ একটি পরিবেশগত ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। স্থানীয় নারীদের ওপর এর প্রভাব ভয়াবহ: জলের অভাব, স্বাস্থ্যঝুঁকি, যৌন নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে।

বিগ শিফ্ট গ্লোবাল-এর দাবিগুলো

এই সংকটের প্রেক্ষিতে, বিগ শিফ্ট গ্লোবাল প্রচার বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর কাছে চারটি স্পষ্ট দাবি উত্থাপন করেছে:

১. সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থায়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে- কয়লা, তেল ও গ্যাসের কোনো ধরনের প্রকল্পে আর কোনো অর্থ বা গ্যারান্টি দেওয়া চলবে না। একটি ন্যায্য পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

২. টেকসই নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে: বিশেষ করে দূরবর্তী ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় যেন সাশ্রয়ী ও নিরাপদ নবায়নযোগ্য শক্তি পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শক্তিশালী পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে: জীবাশ্ম জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পূর্ণ তথ্যপ্রাপ্ত সম্মতি (FPIC) নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে: অর্থায়নের উৎস, প্রকল্পের প্রভাব এবং নির্গমন সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

একটি জরুরি পরিবর্তনের আহ্বান

বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সত্যই দারিদ্র্য বিমোচন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী চায়, তবে তাদের নীতিগত ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জন এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির অর্থনীতি থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য শক্তিতে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়াই একমাত্র পথ। এটি কেবল পরিবেশগত দায়িত্বই নয়, অর্থনৈতিক বুদ্ধিমত্তারও পরিচয়। সময় ফুরিয়ে আসছে। এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।

এই আন্দোলনে সমর্থনকারী সংগঠনগুলোর তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বৈশ্বিক, যার মধ্যে রয়েছে ৩৫০.অর্গ, আফ্রিকা কোলালিশন ফর সাসটেইনেবল এনার্জি অ্যান্ড অ্যাকসেস, ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ, প্যান আফ্রিকান ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যালায়েন্সের মতো শতাধিক সংগঠন। তাদের এই সম্মিলিত কণ্ঠস্বরই বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য এমডিবির নীতিনির্ধারকদের গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারে। আমাদের ভবিষ্যৎ এখনই গড়ে তুলতে হবে, জীবাশ্ম জ্বালানির অতীতের জালে নয়, নবায়নযোগ্য শক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে।

তেরেসা ক্রামার্জ, ফরগটন ভ্যালুজ: দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এন্ড এনভায়রনমেন্ট পার্টনারশিপস

তেরেসা ক্রামার্জ এই বইতে যুক্তি দেখান যে বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সংকট মোকাবিলার একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এনভায়রনমেন্টাল পার্টনারশিপ (MSEPs)-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মতে, এই নির্ভরতা প্রতিষ্ঠানটির আসল ও 'ভুলে যাওয়া মূল্যবোধ'—যেমন সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব—কে পিছনে ফেলেছে। বরং, এই ধরনের অংশীদারিত্বগুলো ম্যানেজেরিয়াল এফিসিয়েন্সি, টেকনিক্যাল ফিক্স এবং নিওলিবারেল মার্কেট-লজিক-কে প্রাধান্য দেয়, যার ফলে সমতা, জবাবদিহিতা ও রূপান্তরধর্মী পরিবেশ-কর্মপরিকল্পনা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

বিগ শিফ্ট গ্লোবালের প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের জলবায়ুবিরোধী জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থায়নের যে চিত্র উঠে এসেছে, ক্রামার্জের এই তত্ত্ব সেই স্ববিরোধিতার একটা কাঠামোগত ব্যাখ্যা দেয়। অর্থাৎ, বইটি বুঝতে সাহায্য করে যে কেন একটি দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থায়িত্বের কথা বলা প্রতিষ্ঠান একই হাতে জলবায়ু সংকটের মূল হোতাদের অর্থায়ন চালিয়ে যায়।

বিগ শিফ্টের সমালোচনার সাথে বইটির মিল

১. *জবাবদিহিতার অভাব ও গভর্নেন্স গ্যাপ:* বিগ শিফ্ট প্রতিবেদন দেখায় বিশ্বব্যাংক কিভাবে গ্যারান্টি, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি বা ডেভেলপমেন্ট পলিসি ফাইন্যান্সের মত জটিল পদ্ধতিতে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে টাকা দেয়, যাতে সরাসরি দায় এড়ানো যায়। ক্রামার্জের বই এই একই সমস্যাকে অন্য কোণ থেকে দেখায়: MSEP-গুলোরও কাজ করার ক্ষেত্র অনেকটাই অস্পষ্ট ও জবাবদিহিতাহীন, যেখানে বড় কর্পোরেশন ও সরকারগুলোর স্বার্থই প্রধান হয়ে ওঠে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা প্রকৃতির দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য নয়। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটির গভর্নেন্স

গ্যাপ স্পষ্ট।

২. *সিস্টেমিক পরিবর্তন নয়, প্রযুক্তিগত প্যাচ-ওয়ার্ক:* বিগ শিফ্ট প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো—যেমন মিয়ানমারে 'অধিক দক্ষ' গ্যাস প্ল্যান্ট বা ইরাকে গ্যাস ফ্লেয়ারিং কমানো—সবই টেকনোক্র্যাটিক, বাজার-ভিত্তিক সমাধানের উদাহরণ। এগুলো উন্নয়নের মৌলিক গতিপথ (যা জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর) বদলাতে চায় না, বরং তার ক্ষতিকর দিক শুধরে দিতে চায়। ক্রামার্জের বই অনুযায়ী, এই মনোভাবই বিশ্বব্যাংকের 'ভুলে যাওয়া মূল্যবোধ'-এর পরিচয়। এখানে লক্ষ্য জনগণের ন্যায্য ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়া নয়, বরং সমস্যাকে শুধু ম্যানেজ করা।

৩. *মূল্যবোধের সংঘাত:* দক্ষিণ আফ্রিকার মেদুপি কয়লা প্রকল্পের বর্ণনায় নারীদের ওপর যে ভয়াবহ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব ফুটে উঠেছে, তা সামাজিক ন্যায়বিচার নামক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠান কীভাবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ক্রামার্জের বিশ্লেষণ বলছে, বিশ্বব্যাংকের এই অংশীদারিত্ব ও প্রকল্প মডেলগুলোতে 'দক্ষতা' ও 'অর্থনৈতিক রিটার্ন'-এর মতো মানদণ্ডই প্রধান, FPIC বা লিঙ্গগত ন্যায়বিচারের মতো মৌলিক বিষয়গুলো নয়।

বইটি ও বিগ শিফ্ট প্রতিবেদন: পার্থক্য ও পরিপূরকতা

দৃষ্টিকোণের পার্থক্য: বিগ শিফ্টের প্রতিবেদনটি মূলত একটি নির্দিষ্ট খাত (শক্তি অর্থায়ন) ও বাস্তব প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংকের ফোরেনসিক সমালোচনা। অন্যদিকে, ক্রামার্জের বইটি একটি একাডেমিক, গভর্নেন্স-ভিত্তিক বিশ্লেষণ যা ব্যাংকের পরিবেশ নীতির কৌশলগত দিকটিকে কেন্দ্র করে। এরা একে অপরের পরিপূরক।

লেজিটিমেসি তৈরি করার কৌশল: এই বইটি বুঝতে সহায়তা করে যে, বিশ্বব্যাংক একদিকে IFC বা MIGA-র মাধ্যমে গ্যাস-কয়লার প্রকল্পে বিনিয়োগ করলেও, অন্যদিকে তার বিভিন্ন শাখা 'পরিবেশগত অংশীদারিত্ব' বা 'সবুজ অর্থনীতি'র প্রচার চালিয়ে সবুজ লেজিটিমেসি বা বৈধতা তৈরি করে। ক্রামার্জের মতে, এই অংশীদারিত্বগুলোকে প্রায়ই আসল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি হিসেবে না দেখে, বরং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা ও সমালোচনা সরানোর একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বইটি বিশ্বব্যাংকের বর্তমান আচরণের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা দেয়। এটি দেখায় কীভাবে অতীত সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ব্যাংক নিওলিবারেল অংশীদারিত্ব মডেল গ্রহণ করলো, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার সময়কার মূল

দর্শন (ন্যায়বিচার, স্থায়িত্ব) থেকে সরে এলো। এ থেকেই বোঝা যায়, শুধু প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করলেই বিশ্বব্যাংকের আচরণ বদলে যায় না।

বইটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বইটি সরাসরি বিশ্বব্যাংকের জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থায়নের কথা বলে না, কিন্তু এটি সেই প্রাতিষ্ঠানিক মানসিকতা ও কাঠামোর গভীর ব্যাখ্যা দেয় যা এমন অর্থায়নকে সম্ভব ও স্থায়ী করে।

বিগ শিফ্ট গ্লোবালের মতো প্রচারের জন্য এই বইটি একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক হাতিয়ার। এটি প্রমাণ করে যে সমস্যাটি কয়েকটি ‘খারাপ প্রকল্প’-এর নয়, বরং বিশ্বব্যাংকে গভীরভাবে গেঁথে থাকা একটি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ব্যবস্থার। বইটি আমাদের শেখায় যে, শুধু ‘জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তিতে টাকা সরানো’ই যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্বব্যাংকের কাজের পদ্ধতি, জবাবদিহিতার কাঠামো এবং নীতিনির্ধারণে সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত অখণ্ডতা-কে আবার কেন্দ্রে আনতে হবে।

এক কথায়, বিগ শিফ্টের প্রতিবেদন আমাদের দেখায় ‘কি’ হচ্ছে, আর ক্রামার্জের বইটি বুঝতে সাহায্য করে ‘কেন’ এমনটা হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের পরিবর্তন শুধু নীতি পরিবর্তন নয়, একটি মৌলিক মূল্যবোধগত পুনর্বিনাসের দাবি রাখে।

বিশ্বব্যাঙ্ক গণশুনানি ছবিমঞ্জুষ - প্রস্তুতিপর্ব

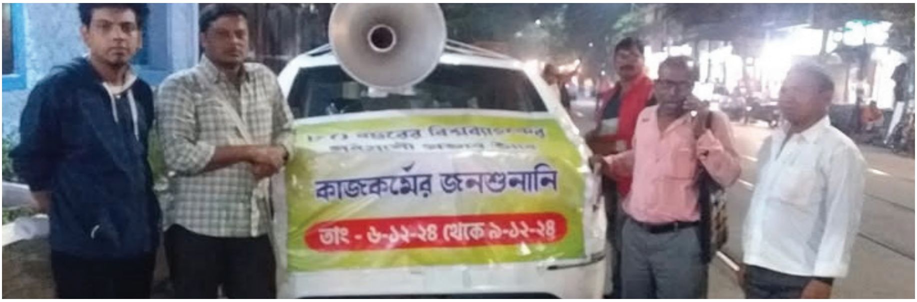

বিশ্বব্যাঙ্ক গণশুনানি ছবিমঞ্জুষ - পোস্টার

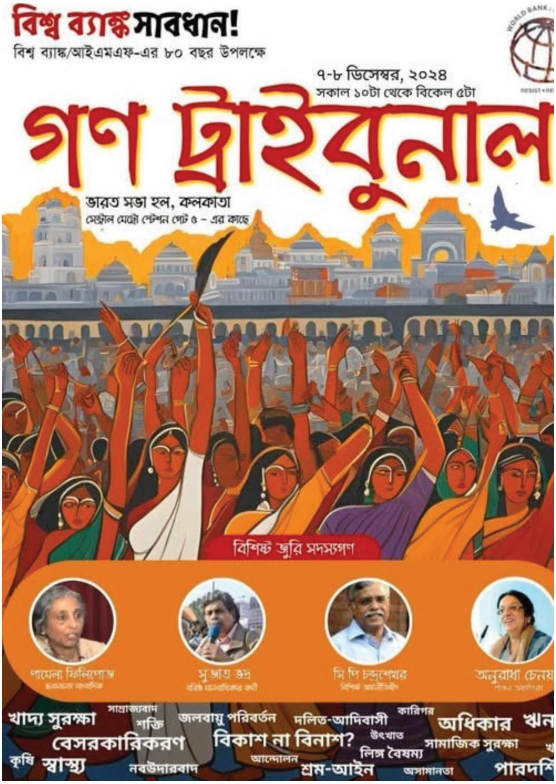

বিশ্বব্যাঙ্ক গণশুনানি ছবিমঞ্জুষ - আরও কিছু ছবি

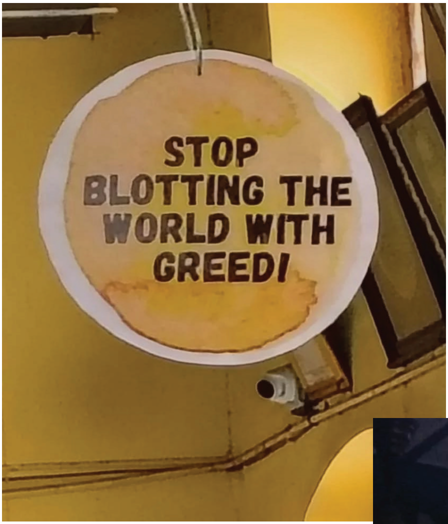

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের ওপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের ওপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা, বাংলার হাট; কিভাবে আজকের যুবা কথামৃত বুঝছে; বনজঙ্গল গাছপালা, আর নয় অঙ্গার এবং হিমাংশু কুমারের সাক্ষাৎকার, বর্তমান পুথি ৮ দশকের বিশ্বব্যাঙ্ক-IMF-এর কাজকর্মের মূল্যায়ন।

১। টড়ের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুন্ত জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের ওপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
৩৫। হিমাংশু কুমারের সঙ্গে কথোপকথন
৩৬। অনন্ত ঋণের বাখান: দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা